চিতা
রেনে জুইজ
সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

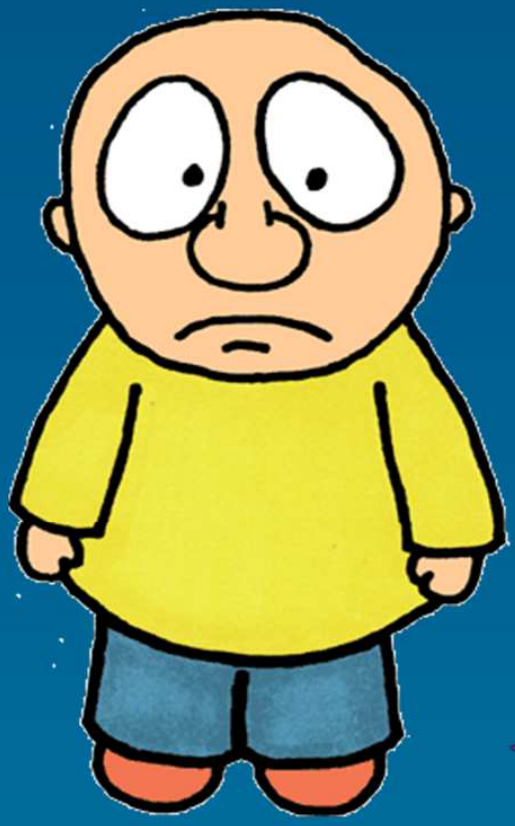

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
৩৩, নর্থব্রুক হল রোড,
ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

Kpo the Leopard
By ; Rene Guillot
Trans ; Rakib Hassan

চিতা

রেনে জুইঅ

রূপান্তর :

রকিব হাসান

এক

সোনালি সকাল

'ঘুমাও,' মেঘ ডাকলো যেন চিরগু-র গলায়, 'ঘুমাও, কেপু।'

মায়ের বিশাল দুই থাবার মাঝে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে বাচ্চাটা। সামান্যতম শব্দেই চমকে উঠছে।

গাছের পাতায় মৃদু খসখস, বাতাসের হঠাৎ পরিবর্তন জানিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের ওপারে উঠি উঠি করছে সূর্যটা।

পাতায় পাতায় ডানা ঘষার শব্দ তুলে উড়ে গেল একটা নিশাচর পাখি।

ঠাণ্ডা অন্ধকার ঝোপের ভেতর থেকে বাতাসে ভর করে উড়ে এলো এক ঝলক বোঁটকা গন্ধ। শেয়াল।

আবার চমকে উঠলো শিশু কেপু। মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ করলো মা, অভয় দিলো মেয়েকে।

ডাল-পাতা বিছানো শয্যায় শুয়ে আছে মা-মেয়ে। পাশে আবগা নেই।

'বাবা কোথায়?' জানতে চাইলো কেপু।

আবগা—বিশাল এক পুরুষ চিতা বাঘ, বনের নিশি সম্রাট, কেপুর বাবা।

'শিকারে গেছে,' জানালো মা। 'তুমি এখন ঘুমাও, কেপু।'

শিকারে বেরিয়েছিলো সম্রাট।

সারা রাত বনের আনাচে-কানাচে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে আবগা। বাউ অঞ্চল, তার সাম্রাজ্য। বিরাট জঙ্গল, বিস্তৃত তৃণভূমি, অগুণতি শিকার। চারপাশ থেকে ঘিরে আছে লাল পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে একপাশে ট্যানকন গ্রাম, তারও পরে ডামুসা মালভূমি।

সাভান্নার (তৃণভূমি) উজ্জ্বল হলুদ রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। লম্বা ঘাসের ডগা, অ্যান্টিলোপ হরিণের চামড়ার মতো রঙ। এক পাশে হঠাৎ দেখা দিলো একটা কালো রেখা, বনের প্রান্ত থেকে একেবারে ক্রি নদীর ধার পর্যন্ত লম্বা। জেব্রার পাল। বাতাসে ভর করে আবগার গায়ের তীব্র গন্ধ গিয়ে লেগেছে ওদের নাকে, পালাচ্ছে। খুরের ঘায়ে লম্বা ঘাসের মাথায় উড়লো ধূলোর মেঘ। দূরে পাহাড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে অগুণতি খুরের শব্দ, কান পেতে শুনছে আবগা।

আবার নীরবতা। কেমন অস্বস্তিকর। চুপচাপ বসে ভোরের আগমন প্রত্যক্ষ করছে যেন পুরো বনভূমি। হঠাৎ চাপা গলায় ডেকে উঠলো একটা পাখি ... লম্বা ঘাসে শিহরণ

তুলে ছুটে গেল হাওয়া ... ম্লান হয়ে এলো আলো-পোকার সবুজ বাতি...ঝোপের ভেতরে আলো জ্বালিয়ে এখনো রাতকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে যেন একটা জোনাকি...

উঠে পড়েছে সূর্য। মাথার ওপরে ঘন পাতার চাঁদোয়া। ফাঁকফোকর দিয়ে চুরি করে ঢুকেছে আলোর রশ্মি, অন্ধকার তাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে প্রাণপণে। আলো একদম সইতে পারে না আবগা, দিনকে ঘৃণা করে। শিশিরে ভেজা ঘাসের ডগায় রোদ, সোনার মতো গলে গলে পড়ছে যেন। সেদিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করলো রাতের সম্রাট।

গহন বনের গভীরে, ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। সুন্দর একটা রাত, কতো তাড়াতাড়িই না ফুরিয়ে গেল!

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চললো আবগা। না, ঘরে নয়। আগে নদীতে যেতে হবে। পানি খেতে হবে পেটপুরে। তারপর ঘরে ফিরে দিনভর ঘুম।

কাছেই পাহাড়ী নদী। কানে আসছে মিষ্টি কুলকুল ধ্বনি। পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে পানি। শীতল, মিষ্টি।

সামনের দু'পা পানিতে নামিয়ে দিলো আবগা। লম্বা জিভের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে প্রথমে দেখলো পানি, তারপর খেতে লাগলো চুকচুক করে। দিনের শুরু, শিগগিরই আলো এসে পৌঁছুবে এখানেও, আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই, রূপালি হয়ে আসছে কালো পানি। পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে

পেলো আবগা; কাঁপছে ছায়াটা। সবুজ চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। ভয়ানক ঐ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকতে নিজেরই ভালো লাগে না, অন্যের লাগবে কি করে!

কাছেই ছুটোছুটি করছে বন মোরগ। ডাকাডাকি করছে। লাল পা, ক্ষুদে ডানা। উড়তে পারে না।

পানি খাওয়া শেষ করলো আবগা। উঠে এলো নদী থেকে। বিশাল হাঁ করে হাই তুললো। ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালালো বনমোরগের দল। ঘুম ঘুম চোখে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো আবগা। ধরতে পারলে মন্দ হতো না। মেয়ের জন্যে নিয়ে যাওয়া যেতো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবগা। নিচু হয়ে গেল, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেললো বুক-পেট। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। একটা ঝোপের কাছে গিয়ে থামলো। সাবধানে উঁকি দিলো, ঝোপের ওপাশে কি আছে, দেখবে।

ঘন হয়ে জন্মানো মিমোসা ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আছে একটা লম্বা গলা। ছোটো ছোটো দুটো শিং, চামড়ায় ঢাকা। জিরাফ। নিশ্চয় আবগার আনাগোনা টের পেয়েছে জানোয়ারটা। পালাচ্ছে না কেন?

ঘন ঝোপে ঢুকে পড়লো আবগা। ওপাশে তাকালো। ও, এই ব্যাপার! বিরাট লম্বা দুই পায়ের ফাঁকে ঘাসের ওপর পড়ে আছে বাচ্চাটা। মিমোসার গন্ধের সঙ্গে চটচটে আঠালো অন্য একটা গন্ধ নাকে আসছে। এইমাত্র বাচ্চা দিলো জিরাফটা।

অসহায়। আবগা আক্রমণ করলে এখন কিছুই করার নেই জিরাফ মায়ের।

রোদ চড়ছে। উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকালো আবগা। সূর্যের একটা রশ্মি এসে পড়লো চোখে। চাপা গলায় গর্জে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে ফেললো। রাতের অন্ধকার পুরোপুরি কেটে গেছে। হিংস্র রাতজাগা জানোয়ারের মতোই যেন গিয়ে লুকিয়েছে গহন বনের ছায়ায়।

আবার জিরাফের বাচ্চাটার দিকে তাকালো আবগা। মনে পড়ে গেল কেপুর কথা। চিরগু-র দুই থাবার আশ্রয়ে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকা একটা রোমশ চামড়ার তুলতুলে বল যেন। নিজের অজান্তেই আবার থাবার ভেতর ফিরে গেল ধারালো বাঁকা নখ। উঠে পড়লো সে। বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতর থেকে।

তালে তালে এদিক ওদিক লম্বা লেজ দুলিয়ে এগিয়ে চললো আবগা। সাহসী হয়ে উঠেছে বনমোরগের দল। কি করে জানি বুঝে গেছে, এই মুহূর্তে তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। সম্রাট। পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে বটে ওরা, কিন্তু বেশি দূর যাচ্ছে না।

উজ্জ্বল সকাল। গাছে গাছে পাখীর কলতান। মৌমাছি আর ভোমরার গুঞ্জনে মুখরিত বনতল। হালকা ডানায় ভর করে বাতাসে ভাসছে রঙিন প্রজাপতি, উড়ে যাচ্ছে এফুল থেকে ওফুলে।

গাঢ় নীল আকাশে মেঘের নাম গন্ধ নেই। সারাটা দিন রোদে পুড়বে সাভান্না, শুকিয়ে মচমচে হয়ে যাবে ঘাস। সারা দিনই থাকবে ওখানে তৃণভোজী প্রাণীর দল। জেব্রা আর ছোটো গ্যাজেল হরিণেরা হাজির হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

মোড় নিলো আবগা। সবুঝ বনের গভীরে গিয়ে ঢুকতে হবে তাড়াতাড়ি। গরম বাড়ছে, সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু...মনে পড়লো তার, কেপুর জন্যে কিছুই নেয়া হয়নি। খালি হাতে যাবে মেয়ের সামনে? আরেক দিকে মোড় নিলো সে। সামনে খানিক দূরে জলাভূমি, বর্ষায় পানিতে ভরে যায়। বছরের এই সময়ে খটখটে শুকনো। খুঁজলে মাগুর মাছ পাওয়া যাবে ওখানে। শুকনো কাদার গভীরে ঘুমিয়ে আছে এখন অদ্ভুত মাছগুলো। বর্ষা আসবে, পানিতে ভরে যাবে জলাভূমি, কাদা গলে যাবে। গা মোড়া দিয়ে ঘুম ভেঙে উঠবে মাগুর, পানিতে হুটোপুটি শুরু হবে ওদের।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। নখের আঁচড়ে মাটির তলা থেকে উঠে এলো একটা ঘুমন্ত মাগুর। মাছটা দাঁতে কামড়ে ধরে বাড়ির দিকে রওনা হলো আবগা। মাথার ওপরে তীক্ষ্ণ কিচির-মিচির। জেগে উঠেছে বানরের দল। সম্রাটকে দেখে চেঁচামেচি বাড়লো ওদের।

পাত্তাই দিলো না আবগা। চোখ তুলে চাইলোও না এক-বার। মাছটা মুখে নিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চললো রাজকীয় চালে।

লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের মগডালে উঠে গেল বানরগুলো। তাদের কাছে এসে বসলো কয়েকটা শিম্পাঞ্জী।

আঙুল তুলে চিতাবাঘটাকে দেখালো এক প্রবীণ শিম্পাঞ্জী। বাচ্চাদের উদ্দেশে জ্ঞান বিতরণ করলো, 'আবগা! দেখেছো, মুখে মাছ? বাচ্চা হয়েছে চিতাবাঘের।'

বড় বড় চোখ করে বিশাল চিতাবাঘের দিকে চেয়ে আছে বাচ্চারা।

'খবরদার!' হুঁশিয়ার করলো বুড়ো শিম্পাঞ্জী। 'এখন ওর নাগালের ভেতরে যাবে না কিছুতেই! বাচ্চার জন্যে ধরে নিয়ে যাবে। সিংহের কাছেও যাবে না এ-সময়। ওদেরও বাচ্চা হয়েছে।'

মুখ থেকে মুখে খবরটা পৌঁছে গেল বনের বানরকুলের কাছে, আবগার বাচ্চা হয়েছে। এ-বনে এখন নিরাপত্তা কম। পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। ডামুসার মালভূমিতে গিয়ে আস্তানা গাড়বে। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে কি যেন শুনলো বুড়ো শিম্পাঞ্জী। না, কোনো ভুল নেই। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে হাতির পাল। কোমোর দিকে যাবে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পেয়েছে ওরা।

'অঙ! অঙ!' গম্ভীর চালে বলে উঠলো বুড়ো শিম্পাঞ্জী।

দলের সবাই বুঝলো, বৃষ্টি আসতে দেরি নেই। আবার সবুজ হয়ে উঠবে সাভান্না, সবুজ হয়ে উঠবে বনভূমি। গাছে গাছে ঝুলবে রসালো ফল। আহ্, কি মজা হবে! আনন্দে

লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চললো বাচ্চারা।

'বেশি খুশি হওয়া ভালো না!' হুঁশিয়ার করলো বুড়ো। 'বৃষ্টির আগেই আসবে ট্যানকন গাঁয়ের শিকারিরা। পাইকারি হারে মারবে জন্তুজানোয়ার। চোখে পড়ে গেলে আমাদেরকেও ছেড়ে দেবে না ওরা। তার আগেই পালাতে হবে।'

মাথার ওপরে কিচির মিচির করতে করতে ছুটে চললো বানরের দল।

মোড় নিলো বুনো পথ। গভীর বনে এসে ঢুকলো আবগা। পেছনে দুর থেকে দুরে সরে যাচ্ছে বানরদের চেঁচামেচি।

আবগার সাড়া পেয়ে পাশের ছোট্ট একটা ডোবা থেকে উড়ে গেল একটা শাদা ইগ্রেট। ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ তুলে ঝোঁপের ভেতরে গিয়ে সেঁধোলো বুনো দাঁতালো শুয়োর। কোনো দিকেই খেয়াল নেই আবগার। ক্লান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে পা টেনে টেনে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। মেয়ের জন্যে খাবার নিয়ে সোজা বাড়ি যাবে এখন সম্রাট।

দুই

সুখের দিন

জীবনের প্রথম দিনগুলো বেশ সুখেই কাটছে কেপুর।

শুকনো মরশুম শেষ হয়ে এসেছে। ভয়ানক গরম। সারাটা দিন আগুনের হল্কা ছড়ায় যেন সূর্য। তবে, বনের গভীরে, আবছা অন্ধকার ছায়ায় গরম কম। ঘন পাতার চাঁদোয়া ভেদ করে পৌঁছুতে পারে না এখানে আলো, পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে যা একটু আসে।

'শোনো,' হঠাৎ বলে উঠলো চিরগু।

শুকনো পাতায় ভারি পায়ের চাপা আওয়াজ। অতি সামান্য, কিন্তু ফাঁকি দিতে পারলো না চিরগু-র তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তিকে। তার সঙ্গী আসছে, বুঝতে পারলো।

'শুনছো, কেপু!'

চোখ মিটমিট করছে কেপু। আলো এখানে খুবই কম, তা-ও সইতে পারছে না। হাই তুললো, চোখ মুদে মায়ের আরো কাছে সরে এলো। মাত্র কয়েক দিন বয়েস। এরই মাঝে শিখে

গেছে কেপু, ঘুমোতে হবে দিনের বেলা, জাগতে হবে রাতে।

চিতাবাঘের ঘুম, একটানা নয়, গাঢ়ও হয় না। শুধু তন্দ্রা। এরই মাঝে মাঝে চোখের পাতা ফাঁক করে তাকায় কেপু। তাকালেই চোখে পড়ে বিচিত্র সব দৃশ্য। কাঁটা ঝোপের ভেতর ছুটোছুটি করছে শাদা বনমোরগ। গাছের ডাল থেকে ডালে লাফালাফি করছে বিচিত্র সব পাখি।

'কেপু, শুনছো?' আবার ডাকলো মা। 'শুনতে পাচ্ছো কিছু?'

চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করলো কেপু। সেই পরিচিত দৃশ্য। কান পাতলো। হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছে। মট করে মৃদু আওয়াজে ভাঙলো একটা সরু শুকনো ডাল।

'আবগা আসছে,' বললো চিরগু।

ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎই বেরিয়ে এলো বিরাট চিতা-বাঘ। সবুজ চোখে তাকালো মেয়ের দিকে। মুখ থেকে নামিয়ে রাখলো মাছটা। লম্বা জিভ বের করে চাটতে শুরু করলো মেয়েকে।

চিরগু-র পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে পড়লো আবগা। চেয়ে চেয়ে দেখছে, দাঁতশূন্য মাড়ি দিয়ে মাছটাকে থেঁতলে ফেলছে কেপু। রস গড়াচ্ছে কশ বেয়ে।

'চিরগু?' নরম গলায় ডাকলো আবগা।

'গাউউউ!' জবাব দিলো বাঘিনী।

'মেয়েটা খুব সুন্দর হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলো চিরগু। 'খুব সুন্দর!' আদর করে এক-বার মেয়ের মাথা চেটে দিলো মা।

'ছেলে হলে খুব ভালো হতো,' বললো আবগা। 'রাজা হতো এ-বনের।'

'মেয়ে হয়েছে, রানী হবে,' বললো চিরগু। বেশি কথা-বার্তা বলার সময় নেই। উঠতে হবে এখন তাকে। খিদেয় পেট জ্বলছে। কিছু একটা শিকার করে খেতে হবে। চোখে আলো সহ্য না হলেও করার কিছু নেই। মা তো, কষ্ট করতে হবেই। তবে ভাবনা তেমন নেই। প্রচুর অ্যান্টিলোপ হরিণ চরছে বনের প্রান্তে। চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারবে একটার ঘাড়ে।

উঠে পড়লো চিরগু। কয়েক পা এগিয়েই ফিরে এলো আবার। মেয়ের গা চাটতে লাগলো। আবার রওনা হলো। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে চাইলো। মেয়েকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কেমন এক ধরনের অস্বস্তিবোধ। জানে, আবগা পাহারায় আছে, বনের কোনো শত্রু ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। তবু যেন মন কেমন করে!

বুনো সরু পথ ধরে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল চিরগু।

বিশাল হাই তুললো আবগা। 'ঘুমাও, কেপু, ঘুমিয়ে পড়ো।' দুই থাবার ওপর থুতনি রাখলো সে। চোখ বন্ধ করলো। ঘুমিয়ে পড়লেও কান খাড়াই থাকবে। সন্দেহজনক সামান্যতম

শব্দ কানে এলেই জেগে উঠবে চোখের পলকে।

সুন্দর সকাল। ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না কেপুর। ও বড়দের মতো নয়, রাতে জেগে থাকতে হয় না। দিন রাতই কেবল ঘুম আর ঘুম। কতো আর পারা যায়? ইস্‌স্‌, কোনো সঙ্গী পাওয়া যেতো যদি, খেলার সাথী।

'কে-পু!...কে-পু!' শোনা গেল মিষ্টি ডাক।

চোখ মেলে চাইলো কেপু। মাথার ওপরে গাছের ডালে এসে বসেছে কয়েকটা লাল রঙের পাখি। ক্ষুদে। বুনো বাদামের সমান বড়। উজ্জ্বল লাল পালক। মিষ্টি গলা। চিতাবাঘকে ভয় পায় না ওরা, বাঘও ওদের ক্ষতি করে না। ঝোপের ওপর, গাছের ডালে বসে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে, চুপচাপ। কোনো বিপদ দেখলেই কলরব করে উঠে উড়াল দেয়। হুঁশিয়ার হয়ে যায় বাঘ।

'কে-পু!...কে-পু!' ডাক ছেড়ে ডাল থেকে নেমে এলো একটা পাখি। কেপুর নাকের কাছে উড়তে লাগলো। খেলতে ডাকছে ওকে।

আর শুয়ে থাকা যায় না। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে উঠে পড়লো কেপু। ওকে উঠতে দেখে ফড়ফড় করে নেমে এলো আরো কয়েকটা পাখি।

নাকের কাছে চলে এলো একটা পাখি। থাবা চালালো কেপু। কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি, রক্তেই মিশে আছে কায়দাটা। পাখিটা তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতি। ফুড়ুৎ করে

চলে গেল সামনে দিয়ে। আবার ফিরে এলো। আবার থাবা চালালো কেপু। এবারেও ধরতে পারলো না।

জমে উঠলো খেলা। প্রতিবারেই যে ব্যর্থ হচ্ছে কেপু, তা নয়। মাঝে মধ্যে নখ লেগে যায় পাখির গায়ে, খসে যায় কিছু লাল পালক। পেঁজা তুলোর মতো বাতাসে ওড়ে।

এই সময়ই উড়ে এলো প্রজাপতি। রঙিন ডানা বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচিয়ে চলে এলো কেপুর নাকের সামনে।

থাবা চালালো কেপু। পাখির মতো গতি দ্রুত নয় প্রজাপতির, ধরা পড়লো বাঁকানো নখরে। চিতাবাঘের বাচ্চার প্রথম শিকার। মুখে ফেললো সে প্রজাপতিটা। কি নরম! চাপ দিতে হলো না, কিছুই করতে হলো না প্রায়, গলে গেল মুখের ভেতর। মায়ের দুধ খেয়েছে খালি এতোদিন, কিংবা এক আধটা মাগুর, অন্য রকম স্বাদ পেল এখন কেপু। প্রজাপতির অভাব নেই। আসছে একের পর এক। পাখির দিক থেকে আকর্ষণ সরে গেল কেপুর। প্রজাপতি ধরে ধরে খেতে লাগলো।

খেলার ছলে প্রথম পাঠ দেওয়া হয়ে গেছে বন্ধুকে। আবার গিয়ে গাছের ডালে বসলো পাখিগুলো।

দূর থেকে ভেসে এলো হুংকার। তারপরেই একটা আর্তনাদ। মায়ের গলা চিনতে পারলেও বুঝতে পারলো না কেপু, শিকার ধরেছে চিরগু।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কেপু। শুয়ে পড়লো এসে বাবার কোল ঘেঁষে।

ফিরে এলো চিরগু। ঠোঁটের কোণে রক্ত। হাঁপাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে এসেছে।

মায়ের কোলের কাছে চলে এলো কেপু। খিদে পেয়েছে।

'দুধ খেয়ে এবার ঘুমাও, কেপু,' বললো মা।

চিরগু-র দুধের বাঁট মুখে পুরলো কেপু। তীব্র ঝাঁঝালো মিষ্টি দুধে ভরে গেল মুখ। আরামে চুষতে চুষতে চোখ মুদলো সে।

দিন যায়। দ্রুত বাড়ছে কেপু। তুলতুলে রোমশ চামড়ার রঙ হচ্ছে উজ্জ্বল। দেখছে, জানছে আজব দুনিয়াকে। রোজই নতুন কিছু না কিছু শেখাচ্ছে তাকে লাল পাখিরা। ইতিমধ্যে বুঝে গেছে কেপু, ওরা তার বন্ধু। প্রথম দিনের মতো ওদের লক্ষ্য করে আর থাবা চালায় না এখন। গায়ে এসে বসলেও কিছু করে না।

এই সময়ই একদিন প্রথম মাংসের স্বাদ পেলো সে। একটা বনমোরগ ধরে আনলো চিরগু। ছিড়ে টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে খেতে দিলো মেয়েকে। আহ্, কি স্বাদ! তাজা গরম মাংস! কি মিষ্টি গন্ধ! দাঁত নেই। মাড়ি দিয়ে চেপে রস খেলো প্রথমে কেপু, তারপর গিলে ফেললো কোঁৎ করে।

দিন আর রাতের তফাৎ পুরোপুরি বুঝে গেছে কেপু। কখন সন্ধ্যা হয়, কখন ভোর হয়, বুঝতে পারে এখন। আলো কমে আসে ধীরে ধীরে। গাছের পাতায় শিহরণ তুলে হঠাৎ স্তব্ধ

হয়ে যায় বাতাস। দূরে ক্রি নদীর ধার থেকে ভেসে আসে সিংহের গুরু গম্ভীর গর্জন। তখন সন্ধ্যা। আঁধার কেটে যেতে থাকে দ্রুত। আশেপাশে নিশাচর জানোয়ারের আনাগোনা। পাখির কলতান শুরু হয়। গাছের পাতায় কাঁপুনি তুলে আবার বইতে শুরু করে বাতাস। তখন ভোর।

চিরগুও প্রতিদিনই কিছু না কিছু শেখাচ্ছে মেয়েকে।

অন্ধকারে ঝোপের ধারে আনাগোনা করে কিছু একটা, বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। হা-হা করে হেসে ওঠে অট্টহাসি।

'হায়েনা,' মেয়েকে বলে মা।

'আর ওই যে, ঝমঝম করছে?' জিজ্ঞেস করে মেয়ে।

'শজারু। গা ভর্তি কাঁটা। হাঁটার সময় বাড়ি খায়, ও-রকম শব্দ ওঠে।'

একদিন। বিশাল গোল চাঁদ উঠেছে গাছের মাথায়। বনের তলায় বিচিত্র আলো আঁধারির খেলা। লাল পাখিরা নেই। বাসায় ঘুমাতে গেছে। কাছেই পড়ে থাকা একটা হরিণের হাড় চাটতে গিয়ে 'ব্বাপরে!' বলে এক লাফে পিছিয়ে এলো কেপু। কালো কালো কি যেন বিজবিজ করছে হাড়ের গায়ে। তার জিভে কামড়ে দিয়েছে।

মৃদু হাসলো মা। বললো, 'পিঁপড়ে।'

সেই মুহূর্ত থেকেই পিঁপড়েকে এড়িয়ে চলতে শিখলো কেপু। শিখলো, হুট করে কিছুতে মুখ দিতে নেই। জেনে শুনে সাবধান হয়ে তারপর মুখ লাগাতে হয়।

সেদিন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলো আবগা, রাত থাকতে থাকতেই। হাঁপাচ্ছে। বেরিয়ে পড়েছে একহাত জিভ। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে শুয়ে পড়লো।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলো চিরগু।

'সাভান্নায় একটা জানোয়ারও নেই। সব ভয়ে পালিয়েছে!'

'মানুষ?' গলা খাদে নামিয়ে বললো চিরগু।

'মানুষ।'

শুয়ে শুয়ে একটা লতার ডগা চিবুচ্ছিলো চিরগু, ফেলে দিলো। ঠোঁটের কোণে লালা। চোখ তুলে চাইলো আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে। বর্ষা ঘনিয়ে এসেছে। এই সময়টাকে বনের জন্তু-জানোয়ারের ভারি ভয়। চিতাবাঘেরাও নিশ্চিন্ত নয়। ট্যানকন গাঁয়ের মানুষের মহা-শিকারের সময় এটা।

তিন

তীর

কেপুর জন্মের সময় সরু, বাঁকা ছিল চাঁদটা। আলো প্রায় ছিলোই না। এখন বড় হয়েছে, গোল ভরাট হয়েছে। বনের তলা. উজ্জ্বল জ্যোৎস্না।

কেপুও শক্ত সমর্থ হয়েছে। তুলতুলে রোমশ বল নয় আর সে এখন। ধারালো হয়ে গেছে তার ক্ষুদে নখগুলো। থাবা মেরে চিরে দিতে পারে গাছের সবুজ বাকল। সুযোগ পেলেই মা-বাবাকে ছেড়ে দূরে সরে যায়। বাসার কাছের প্রথম ঝোপ, পরের ঝোপ, তার পরের ঝোপ করে করে সরে আসে অনেক দূরে। চিতা বাঘের বাচ্চা, ভয়ডর বলে প্রাণে কিচ্ছু নেই।

এখন আবার এক সঙ্গে শিকারে বেরোতে পারবে চিরগু আর আবগা। কিন্তু মেয়েকে একা বাসায় ফেলে গেলে বিপদ হতে পারে। কাছাকাছি শিকার নেই, যে থপ করে ধরে খেয়ে ফিরে আসবে তাড়াতাড়ি। শিকারিদের ভয়ে বেরোতেই চায় না জন্তু জানোয়ারের দল। সেই ক্রি নদীর ধারে না গেলে

আর হরিণ ধরা যাবে না।

বড় চিতা বাঘকে ভয় পায় জানোয়ারেরা, কিন্তু বাচচাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। বরং ওটা লোভনীয় খাবার শেয়াল আর হায়েনার জন্যে। ইদানীং আবার কঙ্গো-উলুর উৎপাত বেড়েছে। আগের দিনও পাহাড়ের ধারে শোনা গেছে ওদের ডাক। মহাহারামী কঙ্গো উলু। দল বেঁধে থাকে ওই বুনো কুকুরের দল। বাগে পেলে সিংহকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। কাজেই নিরাপদ জায়গায় রেখে যেতে হবে কেপুকে।

মাটিতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়, রাখতে হবে গাছের ওপর। বনে অভাব নেই গাছের। শিগগিরিই জায়গা খুঁজে বের করে ফেললো আবগা। নেমে এলো বড়সড় একটা গাছ থেকে।

'চিরগু' বললো আবগা, 'পেয়েছি।'

প্রাণপণে বাধা দিয়েও ঠেকাতে পারলো না কেপু। তার ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরে মুখে তুলে নিলো মা। চিরগু-র দাঁতে ঝুলে থেকে ছটফট করতে লাগলো সে, ছাড়া পাবার চেষ্টা চালালো। রেগে গেল মা। মুখ থেকে নামালো কেপুকে। জোরে এক চাপড় মারলো। ডিগবাজি খেয়ে ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়লো কেপু।

'যদি নিজে নিজেই নেমে চলে আসে?' খাড়া হচ্ছে মেয়ে, সেদিকে চেয়ে আবগাকে বললো চিরগু।

'না, তা পারবে বলে মনে হয় না,' গোঁ গোঁ করে বললো

আবগা।

ঘাড় কামড়ে ধরে আবার মেয়েকে তুলে নিলো চিরগু। ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো কেপু, কিন্তু ব্যর্থ হলো।

ঢালু কাণ্ড বেয়ে গাছের একটা তেডালায় উঠে এলো চিরগু। তিন দিক থেকে এসে কাণ্ডের সঙ্গে মিশেছে তিনটে বড় ডাল। মাঝখানে বড়সড় ঝুড়ির মতো একটা খোঁড়ল। শুকনো ডালপাতা বিছিয়ে বিছানা তৈরি করে রেখেছে আবগা। তাতে মেয়েকে ছেড়ে দিলো চিরগু। আদর করে চেটে দিলো মাথা। শান্ত কণ্ঠে বললো, 'খবরদার, নামবে না! আমাকে নিয়ে শিকারে যেতে চায় আবগা।'

'আবগা যেতে চায়,' এই একটি কথাতেই শান্ত হয়ে গেল মেয়ে। ইতিমধ্যেই শিখে গেছে, মদ্দা চিতাবাঘ বনের প্রভু, তার অবাধ্য হতে নেই।

মৃদু ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করলো কেপু।

'বেশি দেরি করবো না,' বললো চিরগু। 'এই যাবো আর আসবো।'

চুপ করে রইলো কেপু।

'একা একা লাগবে না,' মেয়েকে আশ্বস্ত করতে চাইলো চিরগু। 'এখানে বসে অনেক কিছু দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।'

ওপরের দিকে তাকালো কেপু। গাছের ডালে বসে আছে

তার বন্ধু লাল পাখিরা। অন্ধকার তাদের উজ্জ্বল লাল রঙ কালো করে দিয়েছে।

'কি হলো, কেপু, ভয় পাবে না তো?' জিজ্ঞেস করলো মা।

'না,' বললো কেপু। রাতের আঁধারকে ভয় পায় না চিতা-বাঘের বাচ্চা। বরং অন্ধকারেই তার বেশি আনন্দ। জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে সবুজ চোখ। পরিষ্কার দেখতে পায় সবকিছু।

গাছের গায়ে চিরগুর নখের আঁচড়ের শব্দ শুনলো কেপু। নেমে যাচ্ছে মা। তারপরই শোনা গেল মাটিতে ভারি পায়ের চাপা শব্দ। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে মা-বাবা।

একা হয়ে গেল কেপু। ঘুমিয়ে পড়ছে লাল পাখিরা। আকাশে তারা। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে দেরি হবে। নিচে চারপাশ থেকে আসছে বিচিত্র সব শব্দ, বাতাসে হরেক রকম গন্ধ। চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগছে না কেপুর। খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে একটা ডালে উঠে এলো। বসে বসে দেখতে লাগলো নিচের দৃশ্য।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে দুটো শেয়াল। গাছের তলায় এসেই থমকে দাঁড়ালো। নাক কুঁচকে গন্ধ নিলো বাতাসে। কুঁইই করে আতংকিত ডাক ছেড়ে ছুটে পালালো লেজ তুলে। চিতাবাঘের গন্ধ পেয়েছে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্! অদ্ভুত ওই শব্দ চেনা কেপুর। বাওবাব গাছে ঠোকর মেরে পোকার সন্ধান করছে একজাতের নিশাচর কাঠঠোকরা পাখি।

নড়েচড়ে উঠলো লাল পাখিরা। ডেকে উঠলো একবার। কোনোরকম বিপদ নেই দেখে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

ইস্‌স্‌, এতো দেরি করছে কেন বাবা-মা! গাছের ডালে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না কেপুর। কোথায় গিয়ে মাটিতে লাফালাফি করবে, ডিগবাজি খাবে, তা না...

বিচিত্র একটা শব্দ হলো গাছের তলায়, কেশে গলা পরিষ্কার করছে যেন কেউ। বুল-ফ্রগ। লম্বা ঘাসের ভেতর বসে আছে নিশ্চয় ওই ব্যাঙ, চেনে কেপু। সেদিন একটা ধরে এনেছিলো আবগা।

আবার ডেকে উঠলো ব্যাঙটা। তারপর চুপচাপ।

এখনো ফিরছে না কেন মা! রাত তো শেষ হয়ে এলো! ওই তো, দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি সূর্য উঠছে...না, সূর্য তো না! আলোটা অন্যরকম। বিকেলে সূর্য ডোবার সময় যেমন লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা তেমনি। তাছাড়া পাখীরাও জেগে উঠছে না, গান গাইছে না। পাতায় পাতায় শিহরণ তুলছে না বাতাস।

তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে চমকে উঠলো কেপু। টাইগার ক্যাট! গাছের নিচ দিয়ে ছুটে পালালো বনবেড়ালটা। তার পেছনেই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেল এক জোড়া দাঁতালো শূয়োর। তারপর গেল শেয়াল, আরো একটা শূয়োর, কয়েকটা হায়েনা... আরে, একি শুরু হলো! সবাই এমন পাগলের মতো ছুটছে কেন? নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে সবাই!

আবার ডাকতে শুরু করেছে ব্যাঙটা। থামছে না। আতংকিত গলায় ডেকেই চলেছে একনাগাড়ে!

অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো কেপু। নাহ্, আর বসে থাকা যায় না। কি হয়েছে, দেখতে হচ্ছে। কৌতূহল চাপা দিয়ে রাখতে পারলো না সে কিছুতেই। ঢালু গাছ বেয়ে নামতে শুরু করলো এক পা দু'পা করে। কাউকে শিখিয়ে দিতে হলো না। আপনা-আপনিই থাবার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নখগুলো, গাছের বাকল খামচে ধরে পতনরোধ করছে কেপুর।

মাঝ বরাবর এসে মুখ তুলে চাইলো ও। আলো আরো বেড়েছে। ভয় পেলো চিতাবাঘের বাচ্চা, জীবনে এই প্রথম। ওই আলো তার অপরিচিত, এর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু অবচেতন মন জানিয়ে দিচ্ছে, ভয়ানক বিপদ এগিয়ে আসছে ওই আলোকে ঘিরে।

আরো খানিকটা নেমে এলো কেপু গাছ বেয়ে। তারপর লাফ দিয়ে পড়লো নরম ঘাসের ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে সাভান্না পেরিয়ে ডামুসার কাছে চলে এসেছে আবগা আর চিরগু। এখনো শিকার-মেলেনি। শূন্য সাভান্না।

'পালিয়েছে সব জানোয়ার,' বললো আবগা।

'এদিকেও এসেছিলো ওরা!' চিরগুর গলায় অস্বস্তি। বালিতে বসে যাওয়া কিছু পায়ের ছাপের দিকে চেয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে।

'ওরা' কারা, ঠিকই বুঝতে পারলো আবগা। 'এবছর একটু তাড়াতাড়িই এলো ওরা। হাতিরা নদী পেরোয়নি এখনো।'

'না।'

'বৃষ্টি আসতে কি দেরি আছে!' আকাশের দিকে তাকালো আবগা।

'মনে হয় না। মানুষের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয় হাতিরা। মহাশিকার শেষ করে মানুষ চলে গেলে তবেই পেরোবে ওরা।'

শূন্য খাঁ খাঁ করছে তৃণভূমি। কোথাও একটা জেব্রা কিংবা হরিণ চোখে পড়ছে না। বাতাসে মানুষের গায়ের তীব্র গন্ধ। কোথায় ওরা? বনের ওদিকে?

'চলো, ফিরে যাই।' আবগাও অস্বস্তিবোধ করছে।

চিরগু সায় দিলো।

বনের দিকে রওনা হয়ে গেল আবগা। পেছনে চললো চিরগু। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে দুজনেই। মানুষ মানেই ভয়ানক বিপদ। এর আগেও অনেকবার সাক্ষাৎ হয়েছে ওদের ওই দু'পেয়ে অদ্ভুত জীবগুলোর সঙ্গে। পাকা হারামী জীব ওই কালোরা। গায়ের জোরে পাত্তাই পায় না চিতাবাঘের সঙ্গে। কিন্তু ওদের বিষ মাখানো তীর আর বর্শা বাঘের নখ-দাঁতের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবগা। মানুষের কথা কানে আসছে। সঙ্গিনীকে আরো জোরে পা চালাতে বললো।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বনের প্রান্তে চলে এলো ওরা। অন্ধকার

ছায়ায় বসে হাঁপাতে লাগলো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, কোন্ দিক থেকে আসছে মানুষের কথা। বনের তিন দিক থেকেই কথা আসছে বলে মনে হলো ওদের। বাতাস স্তব্ধ।

হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে তাদের সামনে এসে পড়লো একটা হরিণ। আতংকিত। বাঘ দুটোকে দেখে আরো আতংকিত হয়ে পড়লো। পড়িমড়ি করে ছুটে পালালো একদিকে।

অবাক হয়ে গেছে চিরগু আর আবগা। শিকারকে তাড়া করার কথাও ভুলে গেল।

'চিরগু!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো আবগা। আলো চোখে পড়েছে।

চিরগুও দেখতে পেলো আলো। কেপু বুঝতে পারেনি, কিন্তু ওরা ঠিকই পারলো। আগুন। দাবানল? নাকি মানুষের কাজ?

লাফিয়ে উঠলো আবগা। 'চিরগু, জলদি...'

বড় বড় লাফে এক সঙ্গে দু'তিনটে করে ঝোপ ডিঙিয়ে এগিয়ে চললো আবগা। তার পেছনে চিরগু।

বুনো পথ ধরে এগোনোর সময় নেই। শর্টকাট বেছে নিয়েছে তাই আবগা। তাড়াতাড়ি গাছটার কাছে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। পুড়ে মরার আগেই নামিয়ে আনতে হবে মেয়েকে।

কানে আসছে কিটকিট চড় চড় শব্দ। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে গাছ-পালা লতা-পাতা। বাউ জঙ্গলের মাথায় কালো ধোঁয়া। জন্তু জানোয়ারের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার। আগুনের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে দুই চিতাবাঘ। নদীর দিকে

পালিয়ে যেতে পারে নিরাপদে। কিন্তু কেপুকে ফেলে যায় কি করে ?

'জলদি ! জলদি করো !' গর্জে উঠলো আবগা।

আগুনের কাছাকাছি এসে গেছে ওরা। দম বন্ধ করে দিতে চাইছে ধোঁয়া। নাকে মুখে ঢুকে গিয়ে জ্বালা ধরাচ্ছে। তবু থামলো না চিরগু আর আবগা।

গাছের তলায় আগে এসে পৌঁছুলো আবগা। চিরগু এলো কি এলো না, দেখার সময় নেই। লাফ দিয়ে উঠে পড়লো গাছে। তরতর করে উঠে গেল তেডালায়।

নেই ! কেপু নেই !

ভয়ানক এক হুংকার ছাড়লো সম্রাট। আবার নেমে এলো লাফ দিয়ে।

মাথা গরম করলো না চিরগু। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো চার পাশে। চিহ্ন খুঁজছে। ব্যাঙটা চোখে পড়লো। পেট আকাশের দিকে, মরে পড়ে আছে। বেরিয়ে পড়েছে নাড়িভুড়ি। কেপুর কাজ, বুঝতে পারলো। খুব বেশিক্ষণ হয়নি। তারমানে কাছা-কাছিই কোথাও আছে।

'আবগা !' স্বামীকে ডেকে ব্যাঙটা দেখালো চিরগু।

আবার হুংকার ছাড়লো আবগা। মেয়েকে ডাকলো।

দ্রুত এগিয়ে আসছে আগুন। প্রচণ্ড তাপ লাগছে শরীরে। ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। কিন্তু কেপু কোথায় ? মেয়ের নাম ধরে আবার ডাকলো আবগা।

সাড়া এলো। কাছেই একটা ঝোপে ঢুকে বসে আছে কেপু। আবগাই বের করলো খুঁজে। থরথর করে কাঁপছে ছোট্ট মেয়েটা।

আদর করে মেয়ের মাথা চেটে দিলো চিরগু। আদুরে গলায় ডাকলো, 'কেপু! কেপু!'

আগুন ধরে গেছে ঝোপের এক পাশে। থাবা দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলো আবগা। এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো পোড়া লতা-পাতা। আশপাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে জন্তু জানোয়ার। আতংকিত হুংকার ছেড়ে ঝোপের ওপর দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল একটা সিংহ। সোজা নদীর দিকে ছুটেছে। আর কোনো দিকেই খেয়াল নেই পশু রাজের।

'জলদি!' চেঁচিয়ে উঠলো আবগা। 'বেরোও!'

এমনিতে কোথাও বয়ে নিতে হলে বাচ্চাকে চিরগুই মুখে তুলে নেয়। এখন তুলে নিলো আবগা। এক লাফে বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে।

বনের প্রতিটি গলিঘুপচি চেনা আবগার। জানে, কোন্‌দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। আগুন থেকে বাঁচতে হলে যাবার জায়গা এখন একটাই, ক্রি নদী।

বুনো পথ ধরে যাওয়া চলবে না, জানে আবগা। প্রতিটি পথের মাথায় জাল আর তীর-বল্লম নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে কালোরা। ওদিক দিয়ে গেলেই মরবে। যেতে হবে গভীর বনের ভেতর দিয়ে। ওখানে মানুষ থাকার আশংকা কম।

শক্ত করে কামড়ে ধরেছে বাবা, মায়ের কামড়ের চেয়ে

কর্কশ। কিন্তু কিছু মনে করছে না কেপু। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে বাবা, ভালই লাগছে তার। কেমন এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

সামনে নদী। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। মানুষ দেখা যাচ্ছে না। তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়া, ভীষণ জ্বালা করছে চোখ। কিন্তু থামলো না আবগা। নদীতে নামতে পারলে তবে শান্তি।

আর বেশি দূরে নেই নদী। কয়েক লাফেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেলা আবগা। জন্তু জানোয়ার নেই কেন এদিকটায়? ঝুঁকি নিতে চাইলো না। দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েকে মাটিতে নামিয়ে চাপা গলায় বললো, 'চিরগু!'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পরেলো চিরগু। সামনের দিকে তাকালো একবার। ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। এক জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক। সহজেই বেরিয়ে যাওয়া যায় ওপথে। একটু বেশি সহজে। তার মানে কি? মানুষ আছে। ঘাপটি মেরে বসে আছে দু'পাশে। খোলা জায়গাটা দিয়ে কোনো জানোয়ার বেরোতে গেলেই খতম করে দেবে।

পেছনে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন, দু'পাশে আগুন। বেরোনোর ওই একটাই পথ এখন। দাঁড়িয়ে থাকলে পুড়ে মরতে হবে। আগে বেরোতে চায় আবগা। প্রথম তাকে আক্রমণ করবে ওরা। ব্যস্ত থাকবে। সেই সুযোগে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে চিরগু।

মেয়েকে মুখে তুলে নিলো চিরগু।

কেপুর দিকে একবার তাকালো আবগা। পরক্ষণেই ঝাঁপ দিলো সামনে। দুই লাফে বেরিয়ে গেল খোলা জায়গা দিয়ে।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার। দু'দিক থেকে চেপে এলো কালোরা। জাল আর বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবগার ওপর।

রুখে দাঁড়ালো আবগা। মারাত্মক থাবা চালালো শাঁই শাঁই শব্দে। হাড় ভাঙার বিচ্ছিরি শব্দ উঠলো। আর্তনাদ করে পড়ে গেল একজন মানুষ। আবার থাবা চালালো আবগা। পড়ে গেল আরো একজন। বল্লম আর জাল ব্যবহার করার সময় পেলো না মানুষেরা, তার আগেই ধরাশায়ী হয়ে গেল তিন জন। অন্যেরা পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এই সুযোগে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল চিরগু। সোজা ছুটলো নদীর ধার ধরে।

আবগাও ছুটলো। চিরগুর পাশাপাশি চলে এলো। মুখ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলো কেপুকে। ছুটলো আগে আগে।

তীর থেকে অনেক নিচে নদীর পানি। ঢালু তীরে ঘন হয়ে জন্মেছে ঘাস আর নলখাগড়া। ওগুলোর ভেতর ঢুকে যাবারও কোনো উপায় নেই। রোদের তাপে শুকিয়ে মচমচে হয়ে আছে। আগুন ধরে গেছে। ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বন আর নদীতীরের মাঝে সরু একফালি পথ, আগুন নেই কেবল এখানেই। ওপথেই ছুটছে চিতাবাঘ পরিবারটা।

সামনে মোড়। একপাশে দূরে সরে গেছে জঙ্গল। নদীর

আগাছা নেই এইখানটায়। পাথর। ঘাস জন্মাতে পারেনি। মোড়ের উল্টোপাশে পাথরের টিলা। মাঝখানে সরু একটা গিরিপথ মতো। ওর ভেতরে গিয়ে ঢুকতে পারলে নিরাপদ। আগুনের ভয় নেই।

থেমে পেছনে ফিরে চাইলো আবগা। আছে চিরগু, ঠিক তার পেছনেই।

আবার ছুটলো আবগা। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এলো পাথুরে টিলার কাছে। নিচে কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী।

এক লাফে টিলার গায়ে উঠে এলো আবগা। আলগা পাথরে বোঝাই, পা হড়কে আবার গোড়ায় নেমে আসতে হলো তাকে। কিছুটা উঠে তারপর গিরিপথ। ওখানে ওঠাই এক ঝামেলা।

আবার চেষ্টা করলো আবগা। এবার আর লাফ দিলো না। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে থাবা ঢুকিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। আর মাত্র কয়েক হাত। পাথর না থাকলে ওটুকু পথ কিছুই না। ওপরের দিকে তাকালো সে। গিরিপথের মুখে জন্মে আছে একটা ছোট ঝোপ। অনেক নিচে নদী, পাথরে বোঝাই। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লাফ দিলো আবগা। স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে এসে পড়লো গিরিপথের মুখের কাছে। তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো কেপু। ঘাড়ের চামড়ায় বাবার দাঁত বসে গেছে।

শূন্যে থাকতেই থাবা বাড়ালো আবগা। নখ বাধিয়ে দিলো ঝোপের গোড়ায়। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঝুলে রইলো সামনের দুই পায়ের ওপর। পেছনের পায়ে শক্ত মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালালো। হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়লো আলগা পাথর। তার পর মাটি ঠেকলো পায়ে। ধীরে ধীরে গিরিপথে উঠে এলো আবগা। মুখ থেকে নামিয়ে রাখলো মেয়েকে। ফিরে তাকালো।

দাউ দাউ করে জ্বলছে সারা বন। আলোয় আলোকিত। এখনো অর্ধেক পথও উঠে আসতে পারেনি চিরগু। কোনো কারণে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। পেছনের একটা পা ব্যবহার করতে পারছে না ঠিকমতো। ভেঙ্গে গেল?

লাফিয়ে আবার টিলার গোড়ায় নেমে এলো আবগা। নিচে থেকে ঠেলে দিতে লাগলো চিরগুকে। কোনোমতে উঠে এলো ওরা গিরিপথের মুখের কাছে। এবার মুখে কেপু নেই। লাফিয়ে সহজেই ঝোপের গোড়া ধরে ফেললো আবগা। গিরিপথে উঠে এলো। তিন পা দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে পেঁচিয়ে ধরলো ঝোপের গোড়া। এক থাবা বাড়িয়ে দিলো সামনে।

চিরগুও থাবা বাড়ালো। দুটো হুকের মতো আটকে গেল দুই বাঘের দুই থাবা। টেনে চিরগুকে তুলে আনতে লাগলো আবগা। কাছে এসে গেল চিরগু। থপ করে ওর ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরলো আবগা। দাঁত বসে গেল। কিন্তু গ্রাহ্য করলো না ওরা।

চিরগুও উঠে এলো গিরিপথে। ভীষণ পরিশ্রমে জিভ বেরিয়ে

পড়েছে। হাঁপাচ্ছে দুজনেই।

মাটিতে থাবা মেলে বসে অবাক চোখে দাবানলের দিকে চেয়ে আছে কেপু। এখনও জানে না, ওই আগুনের কারণ কি! জানে না, ইচ্ছে করেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মানুষ। শিকারের নিষ্ঠুর এক কৌশল।

গিরিপথের ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। ধপাস করে কাত হয়ে পড়লো চিরগু। আর পারছে না। রক্ত গড়াচ্ছে পেছনের এক পা থেকে। রানে বিধে আছে একটা তীরের ফলা। পেছনের অংশটুকু নেই। কামড়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছে চিরগু আগেই।

'চিরগু!' নরম গলায় বললো আবগা।

বুঝতে পারলো চিরগু, শক্ত হতে বলছে তাকে আবগা। কেপুকে কাছে টেনে আনলো সে। চাটতে শুরু করলো মেয়ের গা। আসলে অন্যমনস্ক হতে চাইছে।

তীরের ফলাটা যেখানে বিঁধে আছে, তার দুপাশের মাংস নখ দিয়ে চিরে ফেললো আবগা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে ফেললো লোহার ফলা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তুলে নিয়ে এলো। ভীষণ ব্যথা পেলো চিরগু, কিন্তু টু শব্দটি করলো না। আশ্চর্য সহ্য শক্তি!

রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো উরুর ক্ষত থেকে। জিভ দিয়ে চেটে সাফ করে দিতে লাগলো আবগা।

কোনো একটা মজার খেলা, ভাবলো কেপু। উঠে এলো ধীরে ধীরে। আস্তে ধাক্কা দিলো বাবার মাথায়। চোখ তুলে

চাইলো আবগা। কি বুঝলো, কে জানে! সরে গেল।

মায়ের ক্ষতে জিভ ছোয়ালো কেপু। নোনতা তীব্র একটা স্বাদ। এই প্রথম গরম রক্তের স্বাদ পেলো সে। চাটতে থাকলো ক্ষতস্থান।

চার

কঙ্গো-উলুর দল

অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে কাটলো দীর্ঘ ভয়াবহ রাত। ভোর হলো। আগুন জ্বলছে এখনো। বাউ জঙ্গল, আবগার সাম্রাজ্য জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায়, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সাভান্না। এখানে ওখানে কয়েক গুচ্ছ তৃণ আধ-পোড়া হয়ে আছে, ধোঁয়া উঠছে ওগুলো থেকে। শিগগিরই ছাই হয়ে যাবে।

কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে বনের ওপরের আকাশ। লম্বা কিছু কিছু গাছের মাথায় আগুন দেখা যাচ্ছে এখনো।

একটা জানোয়ার চোখে পড়ছে না। খিদেয় জ্বলছে আবগা আর চিরগু-র পেট।

টিলার মাথায় চড়ে কালো সাভান্নার দিকে চেয়ে আছে আবগা। ধোঁয়ার ওপরে চক্কর দিচ্ছে শকুনের ঝাঁক। কাছে-পিঠে কোথাও নিশ্চয় খাবার চোখে পড়েছে, কিন্তু নামতে পারছে না ধোঁয়ার জন্যে।

'কিচ্ছু নেই,' বললো আবগা। দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছে চিরগু। ভয়ানক যন্ত্রণা আহত জায়গায়, মুখ বুঁজে সহ্য করছে চুপচাপ।

মায়ের পাশে বসে আছে কেপু। ভীষণ বিরক্ত করছে সবুজ মাছির ঝাঁক। মায়ের ক্ষত থেকে তাড়াচ্ছে ওগুলোকে। রেগে গিয়ে কোনো কোনোটাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে কিছুদূর, ফিরে এসে আগের জায়গায় বসছে আবার।

বাবা-মার পেটে ক্ষুধার আগুন, কিন্তু কেপুর কোনো অসুবিধে হয়নি এ-পর্যন্ত। খিদে পেলেই মায়ের দুধের বোঁটা মুখে পোরে।

'ঘুমাও, কেপু...' চিরগুর গলায় ক্লান্তি।

খিদের চেয়েও প্রবল তৃষ্ণা। জিভ বেরিয়ে পড়েছে দুই চিতাবাঘের। মুখের ভেতরটা ফুলে উঠতে শুরু করছে ইতিমধ্যেই। নিচেই বইছে নদীর শীতল পরিষ্কার পানি। কিন্তু ওখানে যাওয়া খুব কঠিন। প্রায় খাড়া পাথরের দেয়াল। আবগা যদি কোনোমতে পারেও, ভাঙা পা নিয়ে চিরগু-র পক্ষে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

টিলার উল্টোদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গার পরেই পাহাড়। ঢালে জন্মে আছে ঝোপঝাড়, গাছপালা। আগুন ওখানে পৌঁছুতে পারেনি। ওই জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার থাকলেও থাকতে পারে। ঝোপ কিংবা লম্বা ঘাসের ভেতর পড়ে থাকতে পারে আহত হরিণ।

হঠাৎ ওগুলো চোখে পড়লো আবগার। ঘাসের ভেতর কালো কালো কি যেন নড়ছে। দেখতে অনেকটা হায়েনার মতো।

'আমি যাই, দেখে আসি,' চিরগুকে বললো আবগা। সঙ্গিনীর নাক চেটে দিলো একবার। তারপর রওনা হয়ে গেল।

আলগা পাথর, ঢালু দেয়াল। খাঁজ রয়েছে মাঝে মাঝে। খাঁজে নখ বাধিয়ে অতি সাবধানে নেমে চললো আবগা।

টিলা থেকে নামলো। খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে চলে এলো পাহাড়ের ধারে। এক পাশে নদী। চিকচিক করছে পানি। তৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আগে পানি খেতে হবে। তারপর দেখবে খাবার পাওয়া যায় কিনা।

নদীর দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল আবগা। কালো কালো জীবগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলো।

'উ-লু! উ-লু!'

চমকে ফিরে চাইলো আবগা। গর্জে উঠলো চাপা গলায়। কঙ্গো-উলু!

'উ-লু! উ-লু!' আবার ডেকে উঠলো হায়েনা-কুকুরের দল। ঘাসের মাঝে বড়সড় একটা পাথর। ওটার আশপাশ থেকে বেরিয়ে আছে কয়েক জোড়া চোখা কান।

শক্তিশালী চোয়াল বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেলো আবগা। দাঁতে দাঁতে ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে।

চিরগুও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে। কেপুকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে

হয়তো। পানি খাওয়া আর হলো না। তিন লাফে আবার টিলার গোড়ায় পৌঁছে গেল আবগা। লাফিয়ে লাফিয়ে এসে উঠলো চূড়ায়। হড়হড় করে গড়িয়ে পড়লো পাথর।

'কঙ্গো!' গম্ভীর গলায়, বললো আবগা। 'এক দল। আসছে এদিকেই!'

কুকুরগুলোর পেটে খিদে, আবগা আর চিরগুর মতোই। মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখন বাঘতো বাঘ, মানুষ সামনে পড়লেও ছেড়ে কথা কইবে না। হিংস্রতা, ভয়াবহতায় নেকড়েকেও ছাড়িয়ে যায় এরা।

ঘুমিয়ে পড়েছিলো, বুনোকুকুরের ডাক কানে যেতেই চমকে উঠে বসলো কেপু। অবাক চোখে চেয়ে দেখলো মা-বাবাকে। কোনো কারণে ভীষণ ভয় পেয়েছে···

পাথরে নখ আঁচড়ানোর শব্দ হলো। পাথর গড়িয়ে পড়লো একটা···

'লড়ার অবস্থা নেই তোমার,' বললো আবগা।

'দরকার পড়লে লড়তে হবে,' চাপা হিসহিস শব্দ বেরোলো চিরগুর মুখ থেকে।

'এখানে থাকলে বাঁচতে পারবো না।'

'কেন?'

'টিলাটা ঘিরে ফেলবে ওরা। উঠে আসবে একের পর এক। কটাকে মারবো?···চিরগু, চলো ভাগি। এসো, আমি সাহায্য করবো তোমাকে।'

'সাহায্য লাগবে না,' দাঁড়াতে গিয়েই ককিয়ে উঠলো চিরগু। তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে আহত পায়ে। 'আমাকে ফেলে যাও...কেপুকে নিয়ে যাও...'

'না,' বললো আবগা। 'ঠিক আছে, এসো, কোনো গুহা-টুহা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখি। এক্ষুণি আসবে না ওরা।'

কোনোমতে নিজেকে টেনে নিয়ে চললো চিরগু। বড্ডো কষ্ট হচ্ছে। কেপুকে মুখে নিয়ে হাঁটছে আবগা।

খানিকটা এগিয়েই থামলো। সামনের দিকে দেখিয়ে বললো আবগা, 'ওই যে, দেখেছো?'

দেখলো চিরগু। সরু একটা গুহা। মাথার ওপরে পাথরের ছাত। নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যাবে ওখানে কেপুকে।

গুহার ভেতরে কেপুকে ঠেলে দিলো আবগা। গুহামুখেই শুয়ে পড়লো চিরগু।

নিচে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে কুকুরগুলো। দুই চিতা বাঘকেই পাহাড়ের মাথায় দেখছে ওরা, বাচ্চা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। এক পাশে নদী, তিন দিক ঘিরে রেখেছে ওরা। ওদের চোখ এড়িয়ে নামতে পারবে না বাঘ দুটো। বুঝতে পারছে, টিলার ভেতরে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

'উ-লু!'

'যাবে না ব্যাটারা!' চাপা গোঁ গোঁ করলো আবগা।

'যদি আক্রমণ করে?' বললো চিরগু।

'রাত নামার আগে করবে না!' দিনের আলো পীড়া দিচ্ছে

আবগার চোখে। উল্টো দিকে নীল পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে সূর্য।

'খুব ধৈর্য ওদের। অপেক্ষা করতে পারবে।'

'হ্যাঁ। শেষ না দেখে ছাড়বে না।'

'তোমাকে সাহায্য করবো আমি, আবগা।'

'পারবে না। তুমি আহত।'

'আমার লড়াই তুমি দেখছো, আবগা। ক্ষমতা দেখছো!'

দেখেছে আবগা। সন্তান বাঁচাতে কতোখানি ভয়াবহ হয়ে ওঠে বাঘিনী, দেখেছে সে।

'জানি, চিরগু, তোমার ক্ষমতা জানি। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি, দেখে আসি অবস্থা।'

'ইস্‌স্‌, যদি শুধু পানি খেতে পারতাম!' গুঙিয়ে উঠলো চিরগু।

'হ্যাঁ, যদি পানি খেতে পারতাম!' সঙ্গিনীর কথার প্রতিধ্বনি করলো যেন আবগা।

ওদের নিচেই রয়েছে পানি। গেলেই খাওয়া যায়। কিন্তু যাবার উপায় নেই।

চুপ হয়ে গেছে কুকুরগুলো। ডাকছে না আর। কিন্তু আবগা জানে, পাথরের কাছেই আছে ওগুলো। লুকিয়ে আছে পাথরের আড়ালে, ঘাস আর ঝোপের ভেতরে। ও বেরোলেই ঘিরে ধরবে। ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে। টুকরো টুকরো করবে ছিঁড়ে। টিলার মাথায় চড়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো সে।

দেখতে পেলো না ওগুলোকে।

ফিরে এলো আবগা। আবার ঘুমিয়ে পড়ছে কেপু। চুপ-চাপ শুয়ে আছে চিরগু।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চললো সময়। পিপাসায় ছাতি ফাটছে, কিন্তু নদীতে যাবার উপায় নেই। ওদিকে রোদ চড়ছে।

সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। পরিচিত একটা শব্দ কানে আসতেই চোখ মেললো কেপু। আরে! এখানেও এসেছে ওরা! ঝাঁক বেঁধে বসে আছে টিলার মাথায়। চির্‌প! চির্‌প! ডাকছে। তার বন্ধু, লাল পাখি। আগুনের কবল থেকে বেঁচে গেছে ওরা।

চিরগু আর আবগাও তকোলো পাখিগুলোর দিকে।

'তাজ্জব কাণ্ড, না?' বললো চিরগু।

'হ্যাঁ, খুবই বিশ্বস্ত ওরা,' বললো আবগা। 'ঘুমোনোর চেষ্টা করো। পাখিগুলো পাহারা দেবে আমাদের।'

সঙ্গীকে খুশি করার জন্যেই চোখ মুদলো চিরগু। দুই থাবার ওপর থুতনি রেখে পড়ে রইলো চুপচাপ।

বিকেল গড়িয়ে গেল। সূর্য ডুবলো। আঁধার নামতে দেরি নেই। আবগার কথাই ঠিক! আক্রমণ করতে তৈরি হচ্ছে কুকুরের দল।

'উ-লু! উ-লু!' অখণ্ড নীরবতা ভেঙে দিয়ে ডেকে উঠলো একটা কুকুর।

এক সঙ্গে কলরব করে উঠলো পাখিগুলো। ঘুরে ঘুরে

উড়তে লাগলো টিলার মাথায়।

প্রথমে একটা, আরেকটা, তারপর আরেকটা...ডেকেই চললো কুকুরগুলো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এবার আর ছাড়বে না। আক্রমণ করবেই।

নদীর দিক থেকেও এলো ডাক। পানি খেতে গেছে একটা দল, ওরা ফিরে এলেই যাবে অন্যেরা, বুঝতে পারলো আবগা। মোট কথা, টিলার গোড়ায় পাহারা ঠিকই থাকছে। ব্যাটাদের চোখ এড়িয়ে পালানো একেবারেই অসম্ভব।

পালা করে গিয়ে পানি খেয়ে এলো সবকটা কুকুর। দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হলো না আবগার।

'এইবার আসবে ওরা', বললো ও। 'চিরগু, শুনতে পাচ্ছো?'

নীরবতা।

'এই চিরগু, শুনছো?'

'শুনছি।'

'তুমি থাকো। আমি দেখে আসি।'

খানিক পরেই ফিরে এলো আবগা।

'দেখা যায়?' জিজ্ঞেস করলো চিরগু।

'না। পাথর আর ব্যাটাদের গায়ের রঙ একরকম!'

'ও! যদি খালি পানি খেয়ে আসতে পারতাম, দেখিয়ে দিতাম ব্যাটাদের! পেটে যতো খিদেই থাকুক না, ওদেরকে পরোয়া করি না আমি! কিন্তু পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!'

'আমারও।'

'তুমি যাও, পানি খেয়ে এসো, আবগা।'

'কি করে যাবো?'

'একটা চালাকি করতে হবে।'

'চালাকি!'

হঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করে বসো ওদের। খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়ে এসো। পিছিয়ে যাবে ওরা, শিগগিরিই ফিরে আসবে যদিও। যাও।'

'তারপর?'

'ফিরে এসো, তারপর বলবো। যাও।'

চিরগুর বুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা আবগার। আর কিছু বললো না। নিঃশব্দে উঠে এলো টিলার মাথায়।

অন্ধকার। লড়াইয়ের উন্মাদনা জেগেছে রক্তে। দূর হয়ে গেছে ভয়, শংকা, দ্বিধা।

'মারো!' নিচ থেকে গর্জে উঠলো চিরগু।

লাফ দিলো আবগা।

আবগাকে দেখেই টিলার গোড়ায় এসে জড়ো হয়েছে কয়েকটা কুকুর। ডেকে উঠলো।

চোখের পলকে কুকুরের পালের মাঝে এসে পড়লো আবগা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হলো দুটো কুকুর। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ভয়াবহ থাবার প্রচণ্ড আঘাতে।

ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো কুকুরের দল। আবগাকে মাটিতে ফেলে দিলো।

এক মুহূর্ত। গা ঝাড়া দিলো আবগা। গড়িয়ে সরে এলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। থাবা চালালো। ধরাশায়ী হলো আরো দুটো কুকুর। নাকমুখ ছিঁড়ে গেল কয়েকটার।

আর্তনাদ করে উঠে পিছিয়ে গেল আহত কুকুরগুলো। অন্য-গুলোও ভড়কে গেল। পিছিয়ে গেল। লাফ দিয়ে টিলায় উঠে এলো আবার আবগা। উঠে এলো টিলার মাথায়।

ফিরে চাইলো। আবার এগিয়ে এসেছে কুকুরগুলো। মৃত সঙ্গীদের ছিঁড়তে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

'আবগা!' ডাকলো চিরগু।

কুকুরগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরালো না আবগা। অন্ধ-কারে জ্বলছে সবুজ চোখ। আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে।

'আবগা, শুনে যাও,' আবার ডাকলো চিরগু।

নেমে এলো আবগা।

'আবগা,' বললো চিরগু, 'যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। মরা সঙ্গীদেরকে খেয়েই উঠে আসবে ওরা।'

নিচে দাঁত আর শক্তিশালী চোয়ালে চোয়ালে বাড়ি খাবার শব্দ হচ্ছে। বিচ্ছিরি শব্দ করে হাড় ভাঙছে দাঁতে কামড়ে।

'খেয়ে শেষ করতে সময় লাগবে। এই সুযোগে পানি খেয়ে এসো। জলদি যাও!' তাড়া দিলো চিরগু।

'তুমি যাও, চিরগু।'

'আহ্! তর্ক করো না! জলদি যাও! তুমি খেয়ে এলেই আমি যাবো। যাও।'

'তোমাকে ফেলে যাবো না।'

'অযথা সময় নষ্ট করছো, আবগা, যাও!' অধৈর্য হয়ে উঠেছে চিরগু।

'বেশ।' ঘুরলো আবগা।

'গিরিপথ দিয়ে বেরিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

'এই যাবো আর আসবো।'

চলতে চলতেও কি মনে করে ফিরে তাকালো আবগা। কেপু আর চিরগুকে দেখলো। তারপর আবার মুখ ফেরালো। তাকিয়ে আছে চিরগু। অদৃশ্য হয়ে গেল আবগা। নেমে গেছে ওপাশে।

সময় যাচ্ছে। নিচে থেকে ভেসে আসছে কুকুরগুলোর হাড় চিবানোর শব্দ।

নদীর দিক থেকে হঠাৎ শোনা গেল হুংকার। গর্জে উঠেছে আবগা। সেই সঙ্গে শোনা গেল কুকুরের সম্মিলিত চিৎকার। আর্তনাদ করে উঠলো একটা কুকুর। তারপর আরেকটা। থেমে গেল হাড় চিবানোর শব্দ। নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে এদিকের কুকুরগুলোও।

আবার শোনা গেল আবগার হুংকার। কুকুরের অর্তনাদ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই বসে পড়লো চিরগু। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে, রাগ হচ্ছে আহত পায়ের ওপর। আবগার সাহায্যে যেতে পারছে না।

নিশ্চয়ই বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে আবগা। ঢালু

জায়গা। আলগা পাথর। ওকে একসঙ্গে চেপে ধরে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলবে কুকুরগুলো। দাঁড়ানোর জায়গা না পেলে লড়াই করতে পারবে না আবগা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে কুকুরের দল।

শোনা গেল কুকুরের আর্তনাদ। খানিক পরেই আবগার আতংকিত গর্জন। তারপর চুপচাপ।

'উ-লু! উ-লু! উ-লু!' হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলো কুকুর-গুলো। ডাক বাড়ছেই ওদের। আবগার আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

মাংস ছেঁড়ার শব্দ ভেসে এলো। হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো। তবু সাড়া নেই আবগার।

চুপচাপ। ডাক থেমে গেছে কুকুরগুলোর। অপেক্ষা করছে চিরগু। কিন্তু এলো না আবগা। এতোক্ষণে ফিরে আসার কথা তার।

কি ঘটেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না চিরগুর।

আকাশে তারা। কালো অন্ধকার রাত।

'কেপু!' নিচু গলায় ডাকলো চিরগু।

সাড়া দিলো না কেপু। উঠে দাঁড়ালো। তাকালো মায়ের দিকে। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে, কি করে জানি বুঝে ফেলেছে সে।

কেপু, আমার কাছে এসো!'

মায়ের কোল ঘেঁষে এলো কেপু। ওর মাথা চেটে দিলো

চিরগু।

আবার রক্ত গড়াতে শুরু করেছে চিরগুর ক্ষত থেকে। বসে পড়ে আহত জায়গা চাটতে শুরু করলো সে। রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালালো।

পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা, তবু উঠে দাঁড়ালো চিরগু। মেয়েকে নিয়ে এগোলো গিরিপথের মুখের দিকে। নিচে কি ঘটছে, দেখা দরকার।

অনেক নিচে পানির ধারে গিয়ে জড়ো হয়েছে সব কটা কুকুর। কিছু একটা নিয়ে কামড়া-কামড়ি-খামচা-খামচি করছে। জ্বলে উঠলো চিরগুর চোখ। কিন্তু করার কিছুই নেই। অসহায় চোখে তাকালো দূরের পাহাড়ের দিকে। আকাশের পটভূমিতে পাহাড়ের চূড়াগুলো পরিষ্কার।

চিরগু জানে, আজ রাতে আর শিকারের দরকার নেই কুকুরগুলোর। আট নয়টা কুকুর আর আবগার বিশাল দেহটাকে শেষ করার পর আর জায়গা থাকবে না ওদের পেটে। ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে ওরা। কেপুকে নিয়ে পালাতে হবে সেই সময়।

কিন্তু কোথায় পালাবে? দূরের পাহাড়ের দিকে আবার তাকালো চিরগু। ওদিকে, হ্যাঁ, ওদিকেই চলে যেতে হবে।

খাওয়া শেষ করলো কুকুরগুলো। পানি খেলো। তারপর উঠে চলে গেল একে একে।

এইবার বেরিয়ে পড়া যায়। চিরগু ডাকলো, 'কেপু।'

এগিয়ে এলো কেপু।

মেয়েকে মুখে তুলে নিলো চিরগু। আবার এসে ঢুকলো গিরিপথে। বেরিয়ে এলো অন্য পাশ দিয়ে। পাথরের গায়ে রক্তের চিহ্ন রেখে নেমে চললো ঢালু পাড় বেয়ে।

টিলার গোড়ায় এসে দাঁড়ালো চিরগু অনেক কষ্টে। কুকুর-গুলোর সাড়া নেই। হাঁটতে শুরু করলো সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

খানিকটা এগিয়েই মোড় নিলো নদীর দিকে। পানি খেতে হবে আগে। নইলে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না ওই পাহাড়ের কাছে।

পানির ধারে নেমে এলো চিরগু। কেপুকে মুখ থেকে নামিয়ে রেখে জিভ ছোয়ালো পানিতে। মনে পড়লো আবগার কথা। থমকে গেল পলকের জন্যে। কেপুর কথা মনে করে আবার মুখ নামালো পানিতে। মেয়েকে বাঁচাতে হলে তার নিজেকে বাঁচ-তেই হবে, যে করেই হোক।

পাঁচ

লারুনা

অসহ্য যন্ত্রণা পায়ে। তবু থামলো না চিরগু। মেয়েকে মুখে নিয়ে এগিয়েই চলেছে।

সাভান্নার ওপর দিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে ফেলে এসেছে পোড়া তৃণভূমি। এখানটাতেও এসে পৌঁছে ছিলো আগুন, তবে কোনো করেণে সুবিধে করতে পারেনি। এখানে ওখানে কয়েক গুচ্ছ ঘাস পুড়িয়েই নিভে গেছে।

আধপোড়া কিছু ঘাসের কাছে কালাওর দেখা পেলো চিরগু। বিশাল কালো একটা পাখি, লম্বা ঠোঁট। প্রায় সারাক্ষণই মাটিতে ঠেকিয়ে রাখে ডগা। দেখে মনে হয় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাখিটা। আশেপাশে কয়েকটা বাস্টার্ডের দেখাও পেলো, জোড়ায় জোড়ায় খাবার খুঁটে বেড়াচ্ছে পাখিগুলো।

আরো এগিয়ে দেখা পেলো ফিলিকির। বিষণ্ণ চেহারা, দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে রেখেছে লেজ। বাদামি উজ্জ্বল চামড়া,

খাড়া চোখা রোমশ কান। দেখতে অনেকটা বন বেড়ালের মতো। লিনক্স। কিছু একটা নিয়ে খুব ব্যস্ত জানোয়ারটা। চিরগু-র সাড়া পেয়েই চোখ তুলে তাকালো। থুথু ছেটালো রাগ দেখিয়ে। তারপর সড়ে পড়লো।

কি নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলো ফিলিকি? নিশ্চয় খাবার কৌতূহল হলো চিরগুর। এগিয়ে গেল সে। ও, ইঁদুর। ক্ষুদে মেঠো ইঁদুর। শরীরের তুলনায় লম্বা লেজ। এই লেজের জন্যেই হয়তো, আর সব জাতভাইদের মতো চটপটে নয় এরা। এক থাবায় গোটা চারেক ইঁদুর মেরে ফেললো চিরগু। এর আগে কখনো আর এতো নিচে নামতে হয়নি, এতো বাজে খাবার খেতে হয়নি। কিন্তু পেটে আগুন জ্বলছে, এখন যা পাবে তাই সই। খাবার আগে ইঁদুরগুলোকে কেপুর নাকের কাছে ধরলো সে। গন্ধটা চেনালো। বোঝালো, এ-জিনিস খাওয়া যায়। তারপরই কোঁৎ করে গিলে ফেললো সে ইঁদুর-গুলো।

আবার শুরু হলো চলা। গতি খুবই কম। ক্লান্তি, খিদে, আহত পা, এই তিনে মিলে গতি ব্যাহত করছে। থেমে দাঁড়াতে হচ্ছে মাঝেমাঝেই, জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। তারপর আবার চলা।

আর বেশি দুরে নেই নীল পাহাড়। সবুজের কাছে এসে পড়েছে ওরা। মাথার ওপরে কিচির-মিচির শব্দ। পৌঁছে গেছে লাল পাখির দল। রাজকুমারীকে ছেড়ে থাকতে পারেনি ওরা, ঠিক এসে খুঁজে বের করেছে।

শুরু হলো ঝোপ ঝাড়। মাঝে মাঝে কাদা, খুব বেশি না। তবে বর্ষায় পানিতে ভরে যাবে জায়গাটা। জলাভূমি হয়ে যাবে!

শুকনো একটা ঝোপের পাশে থামলো চিরগু। মুখ থেকে নামিয়ে রাখলো কেপুকে। ঝোপের ওপর এসে বসে পড়লো পাখিগুলো। ওদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালো সে। পাহারাদার আছে। কেপুকে রেখে যাওয়া যায় ওদের দায়িত্বে।

বেশি দুর যেতে হলো না। কয়েকটা ঝোপ পেরিয়েই একটু খোলা জায়গা। শুকনো কাদা। মাটি খুঁড়ে বড় আকারের একটা মাগুর মাছ খুঁজে বের করলো চিরগু। খাবারটা মোটামুটি ভালই হলো।

মেয়ের কাছে ফিরে এলো চিরগু। প্রজাপতি নিয়ে ব্যস্ত কেপু। তার নাকের কাছ দিয়ে ওড়াওড়ি করছে দুটো প্রজাপতি, একটা হলুদ আরেকটা লাল। ধরার চেষ্টা করছে কেপু, পারছে না। বেশ চালাক এই প্রজাপতি দুটো, উড়তেও পারে দ্রুত। বাউ জঙ্গলেরগুলোর মতো বোকা নয়।

যতো চালাকই হোক, শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হতেই হলো। দুটো প্রজাপতিকেই ধরে মুখে পুরলো কেপু। মাথার ওপরে বসে গর্বিত গলায় ডেকে উঠলো লাল পাখির দল। তাদের প্রিয় বন্ধু, রাজকুমারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো।

একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠলো চিরগু। মুখে তুলে নিলো কেপুকে। আবার শুরু হলো পথ চলা। এবারে আর একা নয়, মাথার ওপরে সঙ্গী আছে তাদের। বিশ্বস্ত বন্ধু। লাল পাখির

দল, লায়ার বার্ড। মোটেই মিথ্যুক নয় ওরা, তবু কে যে কেন ওই অদ্ভুত নামকরণ করলো, কে জানে!

গোটা হরিণ একবারে খেয়ে ফেলতে পারে চিরগু, সেই পেটে চারটে ক্ষুদে ইঁদুর আর একটা মাগুর, কতোক্ষণ? আবার জ্বলতে লাগলো খিদের আগুন। সারা শরীরে প্রচণ্ড অবসাদ। বিশাল শূয়োরকে অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে যে চিরগু, কেপুর মতো একটা বাচ্চার ভারই এখন বোঝা মনে হচ্ছে তার কাছে। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখ তুলে তাকালো চিরগু। ওই তো পাহাড়। বেশি দূরে নয়। কিন্তু ওখানে কি পৌঁছুতে পারবে না কোনোদিন! যতোই হাঁটছে, পথ যেন আর ফুরায় না।

তন্দ্রার ঘোরে যেন এগিয়ে চলেছে চিরগু। মুখে ঝুলছে ঘুমন্ত কেপু। মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে লাল পাখিরা, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ চিরগু দেখতে পেলো সবুজ তৃণভূমিতে এসে পড়েছে সে। ভেজা ভেজা ঘাস, ঠাণ্ডা। নিশ্চয় কাছেই কোথাও আছে জলাশয়, কিংবা ঝর্না।

'ওই যে, ওখানে!' চিরগুর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন চেঁচিয়ে বললো লাল পাখিরা। উড়ে উড়ে পথ দেখিয়ে চললো।

ঝর্নার ধারে নরম মাটিতে রসালো উদ্ভিদের খোঁজ করছে কয়েকটা শিম্পাঞ্জী। রানীকে দেখেই চমকে উঠলো সর্দার। দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বিচিত্র ভঙ্গিতে এক

হাত কপালে ঠেকিয়ে রোদ বাঁচিয়ে তাকালো রানী আর রাজকুমারীর দিকে, সতর্ক দৃষ্টি।

'অঙ! অঙ!' ভারি গলায় বললো শিম্পাঞ্জী সর্দার। মাথা ঝাঁকালো জোরে। ঘুরেই ছুট লাগালো পাহাড়ের দিকে। পিছু নিলো সাঙ্গোপাঙ্গোরা।

পানির ধারে এসে থামলো চিরগু। পাশে নামিয়ে রাখলো কেপুকে। জিভ ছোঁয়ালো পানিতে। আহ্, কি ঠাণ্ডা! কি মিষ্টি! খানিকটা খেয়ে নিয়ে কেপুকে ডাকলো। পানি চেখে দেখতে বললো।

খেলো না কেপু।

জিভ ভিজিয়ে কেপুর ঠোঁট চেটে দিলো চিরগু। মেয়েকে বোঝাতে চাইলো: 'বোকা মেয়ে, খেয়ে দেখ্, কি মিষ্টি! আমি না থাকলে পানি খেয়েই বাঁচতে পারবি কিছুক্ষণ!'

খেলো না কেপু। সরে গেল ঝর্নার ধার থেকে। মায়ের ঝাঁঝালো দুধ অনেক বেশি মিষ্টি তার কাছে।

পেট ভরে পানি খেয়ে ঝর্নার ধার থেকে উঠে এলো চিরগু। আবার মুখে তুলে নিলো মেয়েকে। চললো পাহাড়ের দিকে।

মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে চললো লাল পাখির দল। ক্লান্তি নেই যেন আশ্চর্য পাখিগুলোর। উড়েই চলেছে একটানা।

সবুজের বন্যা বইছে যেন এখানটায়। দুপাশে সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। বাম্বাসু নদীর ধারে চলে এসেছে ওরা। নদীর ওপরে কাঠের পুল। ওটা পেরিয়ে যেতে হবে।

স্বপ্নের ঘোরে চলেছে যেন চিরগু। কোনোদিকে খেয়াল দিতে পারছে না। চোখ আধবোঁজা। পুলের নিচে নদীতে ভেসে আছে অসংখ্য কুমির, সেদিকেও খেয়াল নেই। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। এতে একটা সুবিধা হয়েছে। পায়ের ব্যথা আর টের পাচ্ছে না এখন।

পুল পেরিয়ে এলো চিরগু। সামনেই পাহাড়। সরু পথ ধীরে ধীরে উঠে গেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো চিরগু। ফিরে চাইলো একবার পুলটার দিকে। মনের কোথায় যেন বেজে উঠলো একটা চেনা সুর! জীবনের কোনো একটা সময় যেন কাটিয়ে গিয়েছিলো এখানে! কখন? নাকি জ্বরের ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন···

হাঁটতে শুরু করলো আবার চিরগু। গাছ-পালার ভেতরে পৌঁছে গেল। আহ্, কি ঠাণ্ডা বাতাস, কি আরাম! ফুলের সুবাসে বাতাস ভারি। থোকায় থোকায় ঝুলে আছে একজাতের বুনো লাল ফুল। মৌমাছির একটানা গুঞ্জন মধু বর্ষণ করলো যেন কানে। অপরূপ এই বেহেশতে কবে, কোন্‌দিন এসেছিলো সে···

মাথা ঝাড়া দিলো চিরগু। কিন্তু ভাঙলো না স্বপ্ন। ওই তো, এখনো আছে লাল ফুল! পায়ের ক্ষতে সামান্য ব্যথা, পুরোপুরি

অবশ হয়ে যায়নি এখনো পা-টা।

হঠাৎ পুরোপুরি চোখ মেললো চিরণ্ড। পথের দু'পাশে হিবিসকাসের ঝাড়, আর সামনে ওটা কি! লাল কাদায় তৈরি একটা দেয়ালের অবশিষ্ট না! ওটাও তো পরিচিত মনে হচ্ছে··· অবচেতন মনই টেনে এনেছে তাকে এখানে, এটা বোঝার বুদ্ধি বা ক্ষমতা কোনটাই নেই তার···

চোখ মিটমিট করলো চিরণ্ড। ওপরে তাকালো। গাছের ডালে বসে আছে কয়েকটা বানর, তাকেই দেখছে। আরও ওপরে, বানরগুলোর মাথায় বসে আছে বিশাল এক শিম্পাঞ্জী। নিজের অজান্তেই চিরণ্ডর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অস্ফুট একটা শব্দ 'আউরো!'

আউরো! কে সে! নামটাই বা জানলো কি করে! মনে করতে পারলো না চিরণ্ড।

আর পারছে না চিরণ্ড। ভেঙ্গে পড়তে চাইছে শরীর। রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে তীরের ফলায় মাখানো বিষ। অসাধারণ জীবনী-শক্তিই এ-পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। হরিণ বা ওই ধরনের কোনো জানোয়ার হলে কখন মরে যেতো! তবে চিরণ্ডও আর পারছে না। ঘোলা হয়ে আসছে দৃষ্টি।

তবু থামলো না ও। এগিয়ে চললো। পেরিয়ে এলো লাল মাটির ভাঙ্গা দেয়াল। সামনেই বাগান, রঙিন ফুলে ভরে আছে। আগের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় গাছের গোড়া, আগাছায় ভরে গেছে। বাগানের পরেই সুকালাবাংলো টাইপের একটা

বাড়ি। ওইতো বারান্দা! দু'ধারে পাম গাছের সারি। চিরগুর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো একটা বিশাল শাদা ছাগল, অসংখ্য মুরগী বালিতে খুঁটে খাচ্ছে, এক পাশের আম গাছে এক ঝাঁক পায়রা···

গাছের দিকে চোখ তুলে তাকালো চিরগু। কই, পায়রা-গুলো কই? মুরগীগুলোও নেই, ছাগলটাও নেই। শূন্য বারান্দা, শূন্য উঠন। চারদিক থেকে সুকালাটাকে চেপে ধরেছে কাঁটা-লতা। ধ্বংস করে দেবে শিগগিরই। কিন্তু তবু আরো অনেক দিন থেকে যাবে এখানে মানুষ বসবাসের চিহ্ন।

মানুষ! না না, দেবতা! কালোদের মতোই দুটো হাত, দুটো পা; রঙ ধব ধবে শাদা। কালোদের মতো নিষ্ঠুর নন, দয়ার সাগর। হ্যাঁ, আউরোও এখানেই বাস করতো এক সময়, মনে পড়লো চিরগুর। প্রথম যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলো ওই দেবতার কাছেই কাটিয়ে গিয়েছিলো সে। বিপদের দিনে ওই দেবতার কাছেই সাহায্যের আশায় টেনে এনেছে তাকে অবচেতন মন···

কিন্তু কোথায় দেবতা? তিনি কি চলে গেছেন? চিরগুর দুধের পাত্রটা কোথায়? ওটা থেকেই তো কেপুকে খাওয়াতে পারবে···

উৎসুক চোখ মেলে সুকালার দরজার দিকে তাকালো চিরগু। মনে হলো, এখুনি খুলে যাবে দরজা। বেরিয়ে আসবেন দেবতা। হাসবেন। মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে আদর করবেন তাকে। খেতে দেবেন। চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু খুললো না দরজা। এলেন না দেবতা। কোলে তুলে নিলেন না তার মেয়েকে। তিনি কি নেই?

সুকালার আশপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজলো চিরগু। দেবতাকে পেলো না। কোথায় গেছেন তিনি? তবে কি বেড়াতে গেছেন মরুভূমিতে? চিরগুকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেখানে যেতেন তিনি?

তাই হবে।

কেপুকে মুখে নিয়ে সুকালার পাশ কাটিয়ে এলো চিরগু। আবার এগুলো। পাহাড় পেরোতে হবে। যেতে হবে সেই মরুভূমিতে। দেবতাকে খুঁজে বের করতে হবে···করতেই হবে···

সারাটা দিন হাঁটলো চিরগু, সারাটা রাত। পাহাড় পেরিয়ে এলো। নেমে এলো তৃণভূমিতে। ভোরের সোনালি আলোয় চরছে ওখানে হরিণের পাল।

কাছেপিঠেই রয়েছে রসালো লোভনীয় খাবার, কিন্তু ধরার সামর্থ নেই চিরগুর। হরিণ তো দূরের কথা, একটা লাল খরগোশ ধরার ক্ষমতা নেই এখন তার।

তৃণভূমির পরেই আবার বন। বনে এসে ঢুকলো চিরগু। হাঁটতে পারছে না আর এখন ঠিকমতো। মাঝে মাঝেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে আবার কোনমতে। পৌঁছুতেই হবে, হ্যাঁ, যে করেই হোক পৌঁছুতেই হবে

দেবতাদের কাছে।

শেষ হয়ে এলো বন। বেরিয়ে এলো চিরগু। সামনে মরু-ভূমি। সূর্য ডুবছে। লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে, অদ্ভুত এক লালের সাগর যেন! মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ, মরুর বালির মতোই রুক্ষ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বড় বড় কালো পাথর।

এর্গ, বালির মরুভূমি, চিতার (Cheetah) রাজ্য। ওই যে, একপাশের রুক্ষ পাহাড়টা, ওটা চিতার পাহাড়। ওখানেই বাস করে ওরা। কিন্তু দেবতা কই?

আকাশে তারা ফুটছে। আর পারলো না চিরগু। বড় একটা পাথরের পাশে এসে পড়ে গেল। হাঁ করে মুখ থেকে বালিতে ছেড়ে দিলো কেপুকে।

রাত বাড়লো। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে তন্দ্রা টুটে গেল মা-মেয়ের। কঙ্গো-উলুর ডাকের সঙ্গে মিল আছে, তবে আরো টানা, আরো তীক্ষ্ণ, আরো জোরালো। রুক্ষ পাহাড়ের দিকে তাকালো চিরগু। কয়েকটা কালো ছায়া নড়াচড়া করছে।

'মা, শুনছো!' বললো কেপু।

'হ্যাঁ।'

'কারা ওরা! কোনো জানোয়ার?'

'ফাহাদ...ফাহাদের দল। চিতা।'

কালো কালো ছায়াগুলোকে দেখলো কেপু। 'ওরাও কি কঙ্গো-উলুর জাত?'

'হ্যাঁ। আশ্চর্য কি জানিস! ওদের রঙ চেহারা আমাদেরই মতো।'

পাথরের পাশে জায়গাটা বেশি খোলামেলা। চিরগুর ভালো লাগলো না। উঠলো সে। কেপুকে নিয়ে চলে এলো বনের ধারে একটা মিমোসা ঝোপের ভেতর।

ছয়

শেষ শিকার

মরুভূমির দিক থেকে ধেয়ে এলো জোরালো হাওয়া। ঝুরঝুর করে গায়ের ওপর ঝরে পড়লো হলুদ ফুলের পাপড়ি। চোখ মেলে ওপরের দিকে তাকালো কেপু। বাতাসে দুলছে মিমোসা। ওপর থেকে নেমে এসে ওগুলোর গায়ে বাড়ি মেরে আদর করছে যেন আঠা-গাছের কাঁটা বসানো ডাল। হেসে উঠে ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে মারছে তাই মিমোসা।

বাতাসে মৌ মৌ করছে মিমোসার সুবাস। তার সঙ্গে মিশেছে আঠা-গাছের আঠার নেশাধরানো গন্ধ। কেমন ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস।

ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকার কাটতে শুরু করবে শিগগিরই। মরুভূমিতে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা হরিণ। কালচে শাদা চামড়া, সোনালি শিং। লোভাতুর চোখে ওগুলোর দিকে তাকালো চিরগু। কিন্তু লাভ নেই। ওগুলোকে ধরা এখন তার পক্ষে অসম্ভব।

জেগে উঠেছে বনের পাখ-পাখালি। মাথার ওপরে হৈ-চৈ শুরু করেছে নীল বনমোরগ। ডাকাডাকি করছে। পাখার জোর আওয়াজ তুলে ঝুপ ঝুপ করে নেমে আসছে বালির ওপর। ইস্‌স্‌, ওদের একটাকে ধরতে পারলেও মন্দ হতো না! জিভ চাটলো চিরগু।

'স্যাট!' নিচু গলায় মেয়েকে বললো সে।

'স্যাট...স্যাট,' নামটা আউড়ালো কেপু। মুখস্থ করে নিলো। চিনে নিলো পাখিগুলোকে।

বালিতে খাবার খুঁটছে বনমোরগ। কট্‌ কট্‌ করে বিচিত্র আওয়াজ তুলে কথা বলছে একে অন্যের সঙ্গে। ঝোপের ভেতরে চিরগুকে দেখতে পায়নি। কোনো রকম সন্দেহ নেই মনে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কয়েকটা মোরগ।

চুপ করে ওত পেতে বসে রইলো চিরগু। পানি এসে গেল জিভে। স্থির হয়ে আছে একেবারে। ঘায়ের ওপর মাছি বসছে, লেজ নেড়ে ওগুলোও নাড়াচ্ছে না। কোনোমতে একটা ঝাঁপ দিতে পারলেই...

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কলরব করে উঠলো লাল পাখির দল। মাথার ওপর গাছের ডালে বসে রাত কাটিয়েছে ওরা। চমকে উঠলো বনমোরগের দল। আশাহত হয়ে জোরে গর্জে উঠলো চিরগু। চোখের পলকে গাছে উঠে পড়লো বনমোরগগুলো, ওদের কর্কশ চিৎকারে মুখরিত হয়ে গেল সারা বন।

কিন্তু লাল পাখিগুলো এমন বেঈমানী করলো কেন?

চিরগুর উপস্থিতি জানিয়ে দিলো বনমোরগগুলোকে? না, তাদেরকে উত্তেজিত করেছে অন্য কিছু! বড় কয়েকটা পাথরের দিকে চেয়ে চেঁচামেচি করছে ওরা।

ফাহাদ! নিশ্চয় গুহা ছেড়ে দলবল নিয়ে বেরিয়েছে! মরু-ভূমির দিকে তাকালো চিরগু। ঠিকই। একশো ফুট দূরে কয়েকটা বড় পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো চিতার দল। বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিকারে বেরিয়েছে ওরা।

এই প্রথম চিতা দেখলো কেপু। চিতাবাঘের মতোই দেখতে, উজ্জ্বল হলদে চামড়ায় কালো ফোঁটা। তবে আকারে ছোটো, আর চিতাবাঘের মতো থাবার ভেতরে ঢুকে যায় না ওদের নখ। কুকুরের মতো বেরিয়ে থাকে। হাঁটেও অনেকটা কুকুরের মতো। সরু কোমর।

বড় বড় পূর্ণবয়স্ক কয়েকটা চিতার পাশে হাঁটছে ছোটো প্রাণীগুলো। ওগুলো বাচ্চা। আকারে কেপুর সমানই বড়, তবে বয়সে আরো বেশি। কেমন শিকার ধরতে শিখেছে, তার পরীক্ষা দিতে এসেছে। সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, চিতা, বনবেড়াল, এমনি সব শিকারি প্রাণীর বাচ্চাকেই এই পরীক্ষা দিতে হয়। চিতার মতো দল বেঁধে যারা বাস করে, তাদের পরীক্ষা সব চেয়ে কঠিন। দুর্বল অক্ষমের জায়গা নেই দলে। বের করে দেয়া হয় তাকে।

চিতার বাচ্চাদের সঙ্গে শুধু তাদের বাবারা এসেছে। মায়েরা রয়ে গেছে গুহায়, শংকিত। জানে না, কার সন্তান

ফেল করবে পরীক্ষায়। ফিরে আসবে না আর।

সবার আগে আগে চলেছে ফাহাদ, দলপতি। বনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কি যেন ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো পুরো দলটা।

অস্বস্তি বোধ করছে বাচ্চারা। বাবার পেটে মুখ দিয়ে গুঁতো মেরে প্রকাশ করছে সেটা। ছেলেকে চেটে দিচ্ছে বাবা, অভয় দিচ্ছে।

আবার কি ইশারা করলো ফাহাদ।

বড় চিতাগুলো সরে এলো বাচ্চাদের কাছ থেকে। এক জায়গায় জড়ো হলো বাচ্চাগুলো, মাঝে খানিকটা ফাঁক রেখে বসে পড়লো কুকুরের মতো।

বড়দেরকে নিয়ে বনে ঢুকলো ফাহাদ। বনমোরগ তাড়িয়ে বের করবে, ঠেলে দেবে ছেলেদের দিকে। পরীক্ষায় পাশ করতে হলে অন্তত একটা করে মোরগ ধরতে হবে সব ছেলেকেই।

বড়রা ঢুকে পড়েছে বনে। কোনো রকম শব্দ শোনা যাচ্ছে না। টান টান হয়ে আছে ছেলেদের স্নায়ু। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে বনের দিকে, কান খাড়া। স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

উৎসুক চোখে চেয়ে আছে চিরগু। না, শিকারের খেলা দেখার কোনো আগ্রহ তার নেই। ব্যাপারটা অন্য। এক সঙ্গে অনেক মোরগ বেরিয়ে আসবে বন থেকে। সব কটাই মারা পড়বে, এমন নয়। কোনোটা নিরাপদে বেরিয়ে যাবে, কোনোটা

আহত হয়ে উড়ে পালাবে। তেমন একটা মোরগ যদি এসে পড়ে তার কাছাকাছি···

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল ঝোপের ভেতরে। এক সাথে চেঁচিয়ে উঠেছে চিতাগুলো। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল নীল বন মোরগের ভীত কলরব। ডানা ঝাপটানোর ভারি শব্দ। ডাল পাতায় ঘষা লাগার ঝুপঝাপ। লাফিয়ে বনের দিকে কয়েক পা সরে গেল পরীক্ষার্থীরা।

বেরিয়ে এলো মোরগের দল। কেউ ছুটে, কেউ উড়ে। পেছনে বিপদ, সামনেও বিপদ। দিশেহারা হয়ে পড়ল পাখি-গুলো। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে সরে যাবার চেষ্টা চালালো।

প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই প্রাণ হরণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতার বাচ্চারা। লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো শূন্যে। নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিগুলোর পিঠের ওপর উঠে গেল। শূন্যে থাকতেই পাখির ঘাড় কামড়ে ধরে হাত-পা ছড়িয়ে নেমে এলো বালিতে। মুখে ছটফট করছে মোরগ, ডানা ঝাপটাচ্ছে। এর-পর অসহায় পাখির ঘাড় ভেঙে দেওয়া একেবারেই সহজ।

একটি ছেলে ফেল করলো। রোগাটে চেহারা, কাঠির মতো সরু সরু পা। লাফাতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেললো সে। ফসকে বেরিয়ে গেল শিকার।

রক্তের গন্ধ পেয়েছে চিতার বাচ্চারা। শিকারও ছোটাছুটি করছে আশেপাশে। একের পর এক খুন করে চললো ওরা।

কিন্তু রোগা ছেলেটা বার বার ব্যর্থ হলো। একটা মোরগও ধরতে পারলো না সে।

বন থেকে বেরিয়ে এলো বড় চিতারা। যার যার শিকার সামনে নিয়ে হাঁপাচ্ছে ছেলেরা। একটা ছেলের সামনে কিছু নেই। আরেক দিকে চেয়ে আছে সে।

গোল হয়ে বসলো বড় চিতারা। মাঝখানে দলপতি। মিটিং হলো। পাশ-ফেলের খতিয়ান হলো। তারপর ছেলেদের ডেকে নিয়ে উঠে বনের ভেতরে চলে গেল আবার ওরা।

ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে ঝোপের সামনে পড়লো একটা মোরগ। আতংকে দিশে হারিয়ে ফেলেছে। চিতারা চলে গেছে, কিন্তু এখনো সুস্থির হতে পারেনি মোরগটা। লুকানোর জন্যে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর, কল্পনাই করলো না, ওখানে ওত পেতে আছে মৃত্যু।

এক থাবায় মোরগটার দফা রফা করে দিলো চিরগু। পালক ছাড়ানোর সময় নেই। আস্তই মুখে পুরে দিলো, চিবিয়ে গিলে ফেললো।

ছোট মোরগ। চিরগুর পেটের এক কোণও ভরলো না। খিদের জ্বালা আরো বাড়লো।

ঝোপের ভেতর চুপচাপ পড়ে রইলো চিরগু। ঘায়ের গন্ধে মাছি ভন ভন করছে, বার বার এসে বসছে ক্ষতের ওপর। মাছি তাড়ানোরও আর ইচ্ছে নেই তার। জ্বর বাড়ছে। পিপাসায় ফুলে গেছে জিভ। কিন্তু উঠে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না।

মাথার ওপরে ডালে বসে আছে লাল পাখিরা। চুপচাপ চেয়ে আছে নিচের দিকে। কেমন গুম মেরে গেছে ওরাও।

রোদ চড়ছে। গরম বাড়ছে। শিস দিয়ে মরুর দিক থেকে ধেয়ে আসছে উত্তপ্ত হাওয়া। বালি উড়িয়ে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলছে ডাল পাতা ঝোপঝাড়ে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো চিরগু।

মায়ের আচরণে এই প্রথম ভয় পেলো কেপু। কেমন জানি করছে মা! ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় গরগর করছে ওর দিকে চেয়ে। জবাবে নরম গলায় গরগর করে উঠলো কেপু। নাক দিয়ে গুঁতো মারলো মায়ের পেটে। খেলতে অনুরোধ করলো।

কিন্তু খেলার অবস্থা নেই চিরগুর। আহত জায়গায় ভোঁতা একটা যন্ত্রণা, পেটে খিদে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। পাগল হয়ে উঠেছে সে, আর সইতে পারছে না। বনের দিক থেকে ধেয়ে এলো এক ঝলক হাওয়া, নাকে এসে ঝাপটা মারলো লোভনীয় গন্ধ। হরিণ...

একটা পা অকেজো, কিন্তু দাঁত-নখ এখনো ঠিক আছে। একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। কোনো মতে পেট ভরাতে পারলে হয়তো টিকে যাবে প্রাণটা। যাবে সে, চেষ্টা করবে হরিণ ধরার।

কিন্তু কি করে ধরবে? পা কাঁপছে থরথর করে। দাঁড়িয়েই থাকতে পারছে না ঠিকমতো। বনের দিকে চোখ তুলে তাকালো একবার সে। আরে, হঠাৎ এতো সবুজ হয়ে গেল

বনটা ! পরিচিত ! এ-যে বাউ জঙ্গল ! ওই তো, অন্ধকারের সম্রাট, আবগা দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে। কেপুকে গাছের ডালে তুলে রেখে শিকারে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে ! মরুভূমির দিকে তাকালো চিরগু। কোথায় মরুভূমি ! বাতাসে দোল খাচ্ছে লম্বা ঘাস। দিগন্তের কাছে চিকচিক করছে ক্রি নদী। বাতাসে ফুলের সুবাস...আবার বনের দিকে ফিরলো সে...এখনো দাঁড়িয়ে আছে আবগা...আসছি, আমি আসছি... একটু দাঁড়াও..., বলার চেষ্টা করলো চিরগু, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না ! জ্বরের ঘোরে বাউ জঙ্গলের স্বপ্ন দেখছে চিরগু, ভুলেই গেছে কেপুর কথা...

পেটে গুঁতো খেয়ে তাকালো চিরগু।

'কেপু !' মুখ নামালো চিরগু। চাটতে শুরু করলো মেয়ের গা।

মৃদু গরগর আওয়াজ বেরোলো কেপুর গলা থেকে। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো। চোখ মুদলো আরামে।

'ঘুমাও, কেপু, ঘুমাও।'

নিজের দুই থাবার ওপর থুতনি নামিয়ে আনলো কেপু। 'ঘুমাও, কেপু, ঘুমাও !' মায়ের কথা আর কানে যাচ্ছে না কেপুর। ঘুমিয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘুমন্ত মেয়ের দিকে চেয়ে রইলো চিরগু। কানে বাজছে আবগার কণ্ঠস্বর : খুব সুন্দর হয়েছে মেয়েটা !

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর !' বিড়বিড় করলো চিরগু।

মেয়েকে একা ফেলে যাবে ? কে দেখবে তাকে ? ক্ষুদে লাল পাখিরা তাকে কতোখানি সাহায্য করতে পারবে ? বড়জোর সতর্ক করে দেবে ওরা, তারপর নিজেই বাঁচাতে হবে নিজেকে। মা না থাকলে এই ভীষণ বনে কেউ দেখবে না কেপুকে। ঘুমন্ত মেয়েকে মুখে তুলে নিলো চিরগু। কাছেই একটা বড় গাছ, তার গোড়ায় এনে শুইয়ে দিলো। তারপর গাছটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করলো। চক্কর দিতে দিতে সরে যেতে লাগলো দূরে। আশপাশের ঝোপঝাড় ঘাসপাতায় তার গন্ধ লেগে গেল। ওই গন্ধের চক্র ডিঙিয়ে কেপুর কাছে আসতে সহজে সাহস করবে না অন্য কোনো জানোয়ার। কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিলো অবচেতন মন।

থামলো চিরগু। তাকালো। গাছ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গোড়ায় রেখে আসা ঘুমন্ত মেয়েকে চোখে পড়ছে না এখান থেকে। ঘুরে দাঁড়ালো সে। হাঁটতে শুরু করলো।

মিমোসার ঝোপের মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আঠা-গাছ। গন্ধে বনের বাতাস ভারি। জোরে জোরে শ্বাস নিলো চিরগু। বাউ জঙ্গলের গন্ধও এমনি...আবার যেন কানে বাজলো আবগার ডাক। সাড়া দেবার চেষ্টা করলো চিরগু, পারলো না। কেমন ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরোলো গলা দিয়ে...আবার ডাকলো যেন আবগা···দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার ডাক...

বনের ভেতরে এসে ঢুকলো চিরগু। হরিণের কথা ভুলে

গেছে...পায়ের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না আর...কোনো ক্লান্তি নেই যেন শরীরে...জ্বর নেই · কিছু নেই...কিন্তু চোখের সামনে এমন অন্ধকার লাগছে কেন !...

পা টেনে চলতে চলতে হঠাৎ ধপ করে পড়ে গেল চিরগু·

দুরে হঠাৎ যেন থেমে গেল আবগার ডাক...

সাত

সিংহ

মাথা উঁচু করে গাঁয়ে ফিরে এলো কিশোর বীরেরা। মুখে করে নিয়ে এসেছে শিকার, নীল বনমোরগ।

গর্ব ফুটে বেরোচ্ছে চোখে-মুখে। আর কোনো গোত্রের আর কোনো প্রাণীই তাদের মতো লাফিয়ে শিকার ধরতে পারে না। কালো মানুষেরা লাফাতে পারে বটে, তবে শিকার ধরার সময় নয়, শিকার পোড়ানোর সময়। আর তা-ও চিতার মতো এতো ওপরে উঠতে পারে না লাফিয়ে।

তিন দিকে রুক্ষ পাহাড়। সামনে পড়ে আছে পাথরের বিশাল স্তূপ। বালি আর বাতাসের ঘষায় ঘষায় চকচকে মসৃণ হয়ে গেছে পাথরগুলো। আশে পাশে শুধু বালি আর বালি। তেমন কিছুই জন্মায় না এখানে, শুধু কয়েকটা ক্যাকটাস দাঁড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

রুক্ষ কাঁটাগুল্মের ঝাড় আছে দু'চারটে। ঝাড়গুলোকে ঘিরে আছে সবুজ ঘাস, উট আর হরিণের খাবার।

পাথরের স্তূপের ছায়ায় বসেছে চিতাদের সভা।

পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গর্ত। সরু সুড়ঙ্গ চলে গেছে পাহাড়ের অন্তস্থলে, ছোটো ছোটো গুহায় গিয়ে শেষ হয়েছে। একেকটা গুহায় বাস করে চিতাদের একেকটা পরিবার। তাদের নেতা ফাহাদ, বৃদ্ধ এক চিতা। ধূসর হয়ে এসেছে চামড়ার রঙ, গোঁফ ঝরে গেছে। কিন্তু দাঁত এখনো মারাত্মক তীক্ষ্ণ। পুরো গাঁয়ে এখনো সে সব চেয়ে শক্তিশালী চিতা।

শিকারের সমস্ত কলাকৌশল ফাহাদের আয়ত্তে। কোন শিকারের কি স্বভাব, কি করে ধরতে হয় ওদের, সব তার জানা। বাতাসের নাড়ি নক্ষত্র তার মুখস্থ। এই অঞ্চলের আরো অনেক কিছুই তার জানা। উটের পিঠে চেপে বিশাল এর্গ-এর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে যেসব মানুষ, মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখে যারা, তাদের চেনে সে। কোন পথ দিয়ে যায় কাফেলা, জানা আছে। শুধু তাই না, আজালাই—লবণের বোঝা নিয়ে দূর দিয়ে যারা চলে যায়, সেই আলখেল্লাধারী মানুষগুলোকেও চেনা আছে তার।

চিতা সমাজের সমস্ত নিয়ম-কানুন জানে ফাহাদ। কোনো কোনো আইন সে নিজেই তৈরি করেছে, চালু করেছে এ-গাঁয়ের চিতা সমাজে। তার ওপর গভীর আস্থা চিতাদের, তাকে মান্য করে চলে সবাই।

প্রকৃতির ওপরও গভীর জ্ঞান ফাহাদের। এদিকে মরুভূমি দু'রকম, জানে সে। ওই যে, দিগন্ত বিস্তৃত বালির মরুভূমি,

তাকে বলে এর্গ। আর উল্টোদিকে, অনেক অনেক দূরে পাথরে ঢাকা যে মরু, তার নাম রেগ। কড়া রোদে জ্বলে মরুর বুক। ঊষর, নিরস, বন্য, আদিম এই মরুর শেষ সেখানে, যেখানে বইছে মহান নিগার নদী। এই রুক্ষ অঞ্চলে যাদের বাস, তারা মহাতেজী, শক্তিশালী, জীবন-ধারণ ক্ষমতা, সহ্যশক্তি তাদের অপরিসীম। দুর্বলের কোনো স্থান নেই এখানে। অকালেই ঝরে যায় তারা, নীরবে।

ফাহাদকে ঘিরে বসেছে সবাই। মন দিয়ে সবই শুনলো সে, জানলো। একবার করে তাকালো বীর-কিশোরদের দিকে। সব শেষে তাকালো রুগ্ন বাচ্চাটার দিকে। মুখ নামিয়ে রেখেছে সে।

'ওকে ফেলে দিয়ে এসো,' আদেশ দিলো ফাহাদ।

সভা ভাঙলো। যার যার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গুহায় গিয়ে ঢুকলো বাবা-মা, একটা পরিবার ছাড়া।

হতভাগা বাচ্চাটাকে নিয়ে চললো ফাহাদের দেহরক্ষী, চারটে বলিষ্ঠ পুরুষ চিতা। হলুদ বালি পেরিয়ে সবুজ বনে এসে ঢুকলো ওরা। থামলো না। চলে এলো বনের গভীরে, যেখানে থোকায় থোকায় ফুটে আছে হলুদ ফুল, বাতাসে আঠা গাছের আঠার গন্ধ, মৌমাছির গুঞ্জন। চারপাশে ঘন হয়ে জন্মেছে কাঁটা ঝোপ। অসহায় চিতা-কিশোরকে এখানেই তার নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে চললো চার চিতা।

'এটাই আইন··· স্ত্রীর মুখ ঝামটা খেয়ে থেমে গেল পুরুষ চিতাটা।

ভালো করেই জানে সিহো, আইন কি! তবু কেন বার বার একই কথা তাকে শুনিয়ে চলেছে তার সঙ্গী? সভা থেকে ফিরে এসে গুহার অন্ধকার কোণে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে সে। আর বার বার খালি একই কথা শুনিয়ে চলেছে: 'এটাই আইন! এটাই আইন!'

সিহো হতভাগ্য কিশোর-চিতাটার মা।

গুহার অন্ধকার কোণে চুপ করে বসে রইলো বাবা-মা। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন তাদের, তাই এখানে এসে লুকিয়েছে। আরেক কোণে ঘুমাতো তাদের ছেলে, ওখানকার বালি সমান হয়ে আছে এখনো। গোল একটা গর্ত মতো, ছোট্ট ছেলেটা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ঘুমাতো যেখানে।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলো না বাবা। ভোঁতা ঘড়-ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরোলো গলা থেকে।

উঠে দাঁড়ালো সিহো। পায়চারী শুরু করলো গুহার ভেতর। জায়গা খুব কম। এ-দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে মাথা, ও-দেয়ালে পেট, ঘষা লাগছে, কিন্তু খেয়াল নেই মায়ের। ছেলের শোকে ব্যথা ভুলে গেছে। বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। আইন! ওই নিষ্ঠুর আইন মানে না সে। ওই আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না কিছুতেই।

'এটা অন্যায়!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো সিহো। বুক ভেঙে

যাচ্ছে দুঃখে, ঠিকমতো প্রকাশ করতেও পারছে না সেটা। রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে তাই।

'সিহো!'

জবাব দিলো না মা। ভয়ানক রাগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন তার। ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে ইচ্ছে করছে সবকিছু। এখন তার মনের যা অবস্থা, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিতে পারে। শুধু তাই না, ফাহাদকেও গিয়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। ফাহাদের কি! ও ব্যাটা নিঃসন্তান, ছেলে হারানোর ভয় নেই।

'সিহো!'

বৃথা চেষ্টা। সন্তানহারা মাকে শান্ত করতে পরেবে না বাবা। সঙ্গীর কথাই শুনছে না সিহো। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো সে। চাপা, প্রলম্বিত একটা করুণ শব্দ, বোঝাই যাচ্ছে মায়ের বুক ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।

রাগে ক্ষোভে চাপা গর্জন করে উঠলো সিহো। না না, এ অন্যায়, ভারি অন্যায়! তার ছেলের শক্তি কম, তাতে কি হয়েছে! আর সব ছেলেদের চেয়ে তার বয়েসও তো কম ছিলো! শিগগিরই ওকে শিখিয়ে ফেলতে পারতো সিহো, কি করে ছুটতে হয়, শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ওকে সাহসী করে তুলতে পারতো। আর ও শিকার করতে না পারলে অন্যদের কি? তার বাবাই তো শিকার করে এনে খাওয়াতে পারতো। ভীষণ শক্তিশালী তার বাবা। সব চেয়ে দ্রুতগামী

শিকারকেও ধরে ফেলতে পারে নিমেষে। বড় হলে তার ছেলেও নিশ্চয় বাবার মতোই হতো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো মা।

'সিহো; কোথায় যাচ্ছো?'

কোথায় যাচ্ছে, ভালো করেই জানে মা। বাধা দিয়ে কেউ তাকে রুখতে পারবে না। নিষ্ঠুর বনের ভেতর তার ছেলে ভয়ে কাঁপছে, কাঁদছে 'মা মা' বলে। ওকে আনতে হবে না!

'সিহো, আমি বলছি যেও না!'

কোনো ফল হলো না, শুনলো না সিহো। বেরিয়ে যাবেই সে। ছুটে পেরোবে মরুভূমি, ঝোপঝাড় খুঁজে বের করে আনবে তার সোনামানিককে।

'অন্যায়, নিষ্ঠুর ওই আইন আমি মানি না!' গর্জে উঠলো সিহো। 'আমার ছেলেকে বিনা দোষে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মানি না, আমি মানি না!'

সরু সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো সিহো। এক জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করছে কয়েক জোড়া দম্পতি। অবাক চোখে সিহোর দিকে তাকালো ওরা।

কারো দিকেই তাকালো না মা, সময়ই নেই। লাফিয়ে পেরোলো পাথরের স্তূপ, পেরোলো কাঁটাক্যাকটাস, কাঁটা-লতা। প্রায় উড়ে চললো মরুভূমির উপর দিয়ে।

একটা বড় পাথরের ওপর বসে আছে ফাহাদ। দেখলো সবই। কিন্তু থামালো না সিহোকে। সে নেতা, প্রয়োজনে কঠোর হতে হয়। মায়ের দুঃখ বুঝতে পারছে সে। সিহোই

প্রথম মা নয়, এর আগেও আরো অনেক মায়ের ছেলেকে ঝোপে ফেলে আসার আদেশ দিয়েছে ফাহাদ। প্রথম প্রথম ছেলের শোকে পাগল হয়ে ওঠে চিতা-মা। কাউকে পরোয়া করে না তখন। ছুটে যায় ঝোপের ভেতর, যেখানে ফেলে আসা হয়েছে তার ছেলেকে। কিন্তু ফিরে আসতে হয় হতাশ হয়ে। কয়েক দিন কেটে গেলে ঠিক হয়ে যায় আবার। আজতক কেউ ফিরিয়ে আনতে পারেনি নির্বাসনে পাঠানো ছেলেকে। বাচ্চা ছেলের কান্না শুনেই হাজির হয়ে যায় শেয়াল, কিংবা হায়েনা, কিংবা অন্য কোনো মাংসাশী জানোয়ার···

আস্তে করে সামনের দু'থাবার ওপর থুতনি রেখে শুয়ে পড়লো ফাহাদ। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো, পরিকল্পনা করতে লাগলো মহাশিকারের। আবার পাঠাতে হবে ছেলেদের। দিগন্তে, বালির ওপারে আছে তৃণভূমি। ওখানে চরে হাজারো হরিণ, জেব্রা...

বনে এসে ঢুকলো সিংহ। নিঃশব্দে। আশায় দুলছে মন। মৃদু খসখস শোনা গেল সামনের ঝোপের ভেতর। পরক্ষণেই ছুটে বেরিয়ে এলো একটা লাল খরগোশ। তাকে তাড়া করে বেরোলো একটা মরুশেয়াল।

গাছের মাথায় সোনালি রোদ। পড়ন্ত আলোয় সোনালি হয়ে উঠেছে বনের ভেতরটা। গাছ পালার চেয়ে ঝোপঝাড় বেশি এদিকটায়, ফলে আলো বনে ঢুকতে পারছে ভালভাবেই। এতো সুন্দর জায়গায় কিছুতেই ভয় পেতে পারে না তার ছেলে,

ভাবলো সিহো। ছুটাছুটি করতে পারে বড়জোর, তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো কোনো গাছের ছায়ায়।

ছায়ায় ঢাকা প্রতিটি জায়গায় খুঁজে বেড়াতে লাগলো সিহো। শিগগিরই এসে পড়লো জন্তু জানোয়ার চলাচলের সরু পথের ওপর। নীল বনমোরগ আর পাহাড়ী-মোরগের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো। ওগুলোর পাশেই পড়েছে বনবেড়াল আর শেয়ালের পায়ের ছাপ।

তন্ন তন্ন করে খুঁজে চললো সিহো। একটু পর পরই থেমে দাঁড়িয়ে বাতাস শোঁকে। কান খাড়া করে শোনে। সামান্যতম গন্ধ কিংবা সন্দেহজনক শব্দ শুনলেই ছুটে যায় সেদিকে।

পুরোটা বিকেল এভাবেই কাটলো। জঙ্গলের কোন জায়গা খোঁজা বাদ রাখলো না। প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি ছায়া, গাছের তলা, খোঁড়ল, কিচ্ছু বাদ দিলো না। হাঁপিয়ে পড়েছে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে পরিশ্রমে। কিন্তু থামলো না মা। খুঁজেই চললো। আশা ছাড়তে পারলো না কিছুতেই।

সাঁঝ হলো। অন্ধকার নামবে একটু পরেই। বুঝতে পারলো সিহো, আর খুঁজে কোনো লাভ নেই। তার ছেলেকে আর পাবে না, হারিয়ে গেছে ও চিরদিনের মতো। নিষ্ঠুর ঝোপ ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। একবার নিয়ে নিলে আর কখনোই ফেরত দেয় না ওই ঝোপ।

রাগ আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠলো সিহোর। পাগল হয়ে উঠলো সে। দু'চোখে তীব্র ঘৃণা। প্রতিশোধ, হ্যাঁ, প্রতিশোধ

নেবেই সে। দু'টো কাজ করতে চায় এখন সে। লড়াই, এবং খুন। ঝোপের ভেতর নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাংসাশী প্রাণীর দল, বাচ্চা চিতার মাংস যাদের কাছে পরম লোভনীয়। ওদেরকে ধরে, ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিতে চায় সে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়।

পুরো বনের ওপরই রাগ সিহোর। প্রতিটি জন্তু জানোয়ারের ওপর রাগ। গুঙিয়ে উঠলো সে। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে খুনী? খুঁজে বের করবেই সে, ছাড়বে না। হায়েনা আর বনবেড়ালের গন্ধ আসছে নাকে। রাত নামছে, বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, ঘাস-পাতায় গন্ধ লাগলে থাকবে অনেকক্ষণ। শিকারে বেরোতে শুরু করেছে শিকারী জানোয়ারের দল। খুনীকে খুঁজে পাওয়ার উপযুক্ত সময় এটা।

হঠাৎ ওটা চোখে পড়লো সিহোর। খানিক দূরে শুয়ে আছে একটা জানোয়ার। বিশালদেহী। ওই জীবের নাম সে জানে, কিন্তু এর আগে কখনো দেখেনি। দেখার কথাও নয়। কারণ ওরা অন্ধকারের জীব, গভীর বনের জীব। খোলা জায়গায় বেরোয় না, দিনকে ঘৃণা করে। চিতার মতোই সোনালি চামড়ায় কালো ফোঁটা। ঝরা পাতার ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে জীবটা। রাত বাড়লেই জেগে উঠবে, কারণ অন্ধকারেই শিকার ধরে ওরা।

কাছে এগোলো সিহো। নিঃশব্দে। শুকনো পাতায় শব্দ হলো না, সরু শুকনো একটা ডালও ভাঙলো না পায়ের চাপে।

বিশাল দেহটাকে দেখে এতোই অবাক হয়েছে সে, কাছের ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো দুটো বড় শেয়াল, এটাও খেয়াল করলো না। টান টান হয়ে উঠেছে সিহোর প্রতিটি স্নায়ু, জানোয়ারটাকে নড়ে উঠতে দেখলেই স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে গিয়ে ওর ওপর। যতো বড়ই হোক না কেন, ছাড়বে না। নিশ্চয় ওটাই খুন করেছে তার ছেলেকে! খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছে!

আশ্চর্য! সামান্যতম নড়ছে না চিতাবাঘটা! না নড়ুক, সিহোই জাগাবে তাকে। মৃদু ডাক ছাড়লো সে। চিতার লড়াইয়ের আহ্বান। নড়লো না চিতাবাঘ। জোরে হাঁক ছাড়লো সিহো। বাঁশির আওয়াজের মতো একটা শব্দ, আরো জোরালো, অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করলো সে। নখের আঘাতে পেছনে ছিটকে পড়তে লাগলো ঘাসপাতা, বালি। নড়লো না চিতাবাঘ।

হঠাৎ থেমে গেল সিহো। চোখ পড়েছে চিতাবাঘের পেছনের এক রানের ওপর। বিচ্ছিরি একটা ঘা, হাঁ হয়ে আছে। লালচে-কালো মাংস দেখা যাচ্ছে। কালো রক্ত গড়িয়ে পড়েছে ওখান থেকে, শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। অবাক হয়ে কয়েক পা এগোলো সে। গন্ধ শুঁকলো। নাকমুখ কুঁচকে পিছিয়ে এলো।

চিতাবাঘটা কেন নড়ছে না, বুঝতে পারলো সিহো। ওটা আর কোনোদিনই নড়বে না, মরে গেছে।

সরে এলো সিহো। আরো খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো

শত্রুকে। বৃথা। তার গর্জন শুনেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে সব জন্তুজানোয়ার। আজ রাতে আর এদিকে ঘেঁষবে না ওরা।

আর কি করবে? ফিরলো সিহো। ফিরে যাবে আবার গুহায়। রাত বাড়ছে। অন্ধকারকে পছন্দ করে না চিতারা। দিনের বেলায় শিকার করতে ভালোবাসে।

হাল ছেড়ে দিয়েছে সিহো। এটাই নিয়ম।

চাঁদ উঠছে। বনের বাইরে বেরিয়ে এলো সিহো। বালিতে অসংখ্য পায়ের ছাপ, চিতাদের। বেশির ভাগই বাচ্চা চিতার পায়ের ছাপ। সকালে এখানেই বনমোরগ শিকার করছিলো ওরা। বাতাসে ভুরভুর করছে চিতার গায়ের গন্ধ। নাক উঁচু করে শুঁকতে লাগলো সে।

বালির দিকে তাকালো আবার সিহো। শুঁকলো। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আলাদা করে চেনার উপায় নেই তার ছেলের গন্ধ। মরুভূমির দিক থেকে ধেয়ে আসছে জোরালো হাওয়া, বনের প্রান্তে গাছগুলোতে বাড়ি খেয়ে শাঁই শাঁই আওয়াজ তুলছে, থেমে যাচ্ছে গতি। বনের পাশ দিয়ে এগোলো সিহো।

হঠাৎ কানে এলো কান্নার শব্দ। বড় একটা গাছের গোড়া থেকে আসছে। বাচ্চা জানোয়ারের কান্না বলেই মনে হলো! পাঁই করে ঘুরলো সিহো। সাবধানে পা বাড়ালো।

দুরদুর করছে বুকের ভেতর। আশা হচ্ছে, সেই সঙ্গে ভয়...কিন্তু!...কিন্তু ঝোপ একবার কাউকে নিলে তো আর

ফিরিয়ে দেয় না ! ...ফাহাদের আইনের যেমন ব্যতিক্রম নেই, ঝোপের আইনেরও তেমনি নড়চড় নেই ! তাহলে ! আবার কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা ! না, সিহোর ছেলে নয় । কান্নাটা কেমন অপরিচিত, চিতাশিশুর কান্না নয় ! কেমন যেন ভোঁতা আর ভারি !

কয়েক পা এগোতেই নাকে এসে আঘাত হানলো যেন একটা বিজাতীয় গন্ধ। আশপাশের ঘাসপাতা ঝোপঝাড়ে লেগে আছে তীব্র হয়ে।

অতি সাবধানে গন্ধ অনুসরণ করে এগোলো সিহো। বড় গাছটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ধীরে ধীরে কাছে পৌঁছে যাচ্ছে গাছের। হঠাৎ বুঝে ফেললো ওটা কিসের গন্ধ। পড়ে থাকতে দেখে এসেছে জীবটাকে একটু আগে। চিতাবাঘ।

আবার কেঁদে উঠলো চিতাবাঘের বাচ্চা। করুণ, অসহায় শোনালো। মাকে ডাকছে। নাক কুঁচকালো সিহো, মুখ বিকৃত করলো। গন্ধের চক্র ভেদ করতে দ্বিধা হচ্ছে। তারপর হঠাৎই মনস্থির করে নিয়ে এক লাফে ঢুকে পড়লো চক্রের ভেতর।

চিত হয়ে পড়ে আছে কেপু। আকাশের দিকে পা তুলে দিয়ে কাঁদছে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার শাদা পেট। চারপাশে ফড়ফড় করছে কয়েকটা লাল পাখি, গায়ে বসছে, উড়ছে, আবার বসছে। সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

বড় কোনো একটা জানোয়ার আসছে, টের পেয়ে গেল কেপু। মা নয়, এটাও বুঝতে পারলো। চিরশত্রু কাছে আসার

আগে ঘড়ঘড় শব্দ করে জানান দেবেই। এক গড়ান দিয়ে উঠে পড়লো কেপু। তাকালো। তারই দিকে তাকিয়ে আছে একটা জানোয়ার।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল লাল পাখিরা। উড়ে গিয়ে বসে পড়লো গাছের ডালে।

সিহো তাকিয়ে আছে কেপুর দিকে। তার ছেলের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ওই বাচ্চাটার। তেমনি লালচে-সোনালি চামড়ার রঙ, কালো কালো কোঁটা। গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারা। অসহায়।

মাথা কাত করে চেয়ে আছে লাল পাখিরা।

অচেনা জানোয়ারটাকে দেখে প্রথমে মুখ ভেঙচালো কেপু। থুথু ছেটালো। হিসিয়ে উঠলো জোরে। তারপর থেমে গেল। চোখ আধবোঁজা করে চেয়ে রইলো। মোলায়েম গলায় তার উদ্দেশ্যে কথা বলছে চিতাটা। চিরগুর মতোই নরম, স্নেহভরা কণ্ঠস্বর।

'এদিকে এসো,' থাবা তুলে ডাকলো চিতা-মা।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলো কেপু। নড়লো না।

'এসো!'

তবু নড়লো না কেপু।

এগিয়ে এলো সিহো। বাচ্চাটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বাধা দেবার চেষ্টা করলো কেপু। নরম ঘাসে আঁচড় কাটতে লাগলো। তারপর থেমে গেল। মাথায় লাগছে গরম নিঃশ্বাস।

আদর করে তার মাথা চেটে দিচ্ছে চিতা, তার মায়ের মতোই।

বসে পড়লো সিহো। কাছে ঘেঁষে এলো কেপু। নাক দিয়ে আলতো গুঁতো লাগালো চিতা-মায়ের পেটে। নরম রোম, চিরগুর মতোই। গন্ধটা অবশ্য অন্যরকম।

সিহোর কোলের কাছে বসে পড়লো কেপু। নাক দিয়ে আস্তে আস্তে গুঁতো দিচ্ছে চিতার পেটে। গলা দিয়ে নরম একটা গররর আওয়াজ বেরোচ্ছে। তবে ভয় পাচ্ছে না আর। সংশয় কেটে গেছে।

নাকে এসে লাগলো এক ঝলক হাওয়া। বিচ্ছিরি তীব্র একটা গন্ধ।

'শেয়াল!' বললো কেপু। চিরগুর সঙ্গে এভাবেই কথা বলতো।

'হ্যাঁ, শেয়াল!' চিরগুর ভঙ্গিতেই বললো সিহো।

ব্যস, ভাব হয়ে গেল দুজনের।

গাছের ডালে বসে সবই দেখছে লাল পাখিরা। শুনছে কথাবার্তা। এক ডাল নিচে নেমে এলো ওরা। আরো ভালো করে দেখার জন্যে।

দুজনে দুজনের চোখের দিকে চাইলো। কেপুর চোখ উজ্জ্বল সবুজ, সিহোর সোনালি।

'আমাকে ভয় পাচ্ছো না তো?' জিজ্ঞেস করলো সিহো।

'গররর!' তার মানে 'না'।

'আমার কোলে আরাম লাগছে?'

'গররর !'

বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে সিহোর। 'তোমার কি নাম ?'

'কেপু !' তার নাম জানে না এতো বড় জানোয়ারটা, ভেবে অবাক হলো সে। আবার বললো, 'কেপু !'

'কেপু ! বাহ্, খুব সুন্দর নাম !' বলে কেপুর নাক চেটে দিলো সিহো আদর করে। কেপুও তার নাক চেটে দিলো।

সময় কোথা দিয়ে বয়ে গেল, খেয়ালই নেই সিহোর। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো, পাহাড়ের দিকে হেলে পড়েছে চাঁদ।

কোলের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কেপু। বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার, কিন্তু এ-মুহূর্তে বাচ্চাটার ঘুম নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না সিহোর।

পশ্চিম আকাশে আরো ঢলে পড়লো চাঁদ। নীলচে দেখাচ্ছিলো ক্যাকটাস, আবার সবুজ হতে শুরু করেছে। মরুর ওপরে ধোঁয়াটে কুয়াশা। পাহাড়ের নিচে আবছা ছায়া। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। আর দেরি করা যায় না। উঠলো সিহো।

গুহায় ফিরে চললো সে। মুখে বাচ্চা। তার জন্যে ভারি। এখনো ঘুমিয়ে আছে চিতারা। কেউ জেগে ওঠেনি, গুহার বাইরে নেই একটাও। পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় নিজের গুহার মুখে এসে পৌঁছুলো সিহো। কেপুকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। নতুন এক জীবন শুরু হলো আবগা আর চিরগুর মেয়ের।

রাজকুমারীকে মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অন্য একটা জানোয়ার। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে লাল পাখিরা। যদিও বুঝে গেছে ওরা, তাদের বন্ধুর কোনো ক্ষতি করবে না জীবটা।

পুবের আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে। আজ একটু বেশি সকালেই জেগে উঠেছে লাল পাখিরা। মাথার ওপরের আকাশে চক্কর দিতে দিতে কেপু আর সিহোকে অনুসরণ করে এলো ওরা। রাজকুমারী গুহার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু গেল না পাখিরা। বসে পড়লো গুহামুখের ওপরে একটা পাথরে। রাজকুমারীর বেরোনোর অপেক্ষায় রইলো।

আট

ফাহাদ

'সিহো!'

জবাব নেই।

'সিহো, শুনছো?'

'শুনছি! একই কথা বার বার বলছো!'

'শিগগিরই জেনে যাবে ওরা। বুঝতে পারছো না?'

'পারছি।'

'ফাহাদ কৈফিয়ৎ চাইবে।'

'ফাহাদ বুড়ো হয়েছে। সব সময়ই সে আমাদের নেতা থাকবে না।'

'কিন্তু এখন তো নেতা।'

'জানি। এ-ও জানি, আইন তৈরি করে সে।'

কথা বলছে দুই চিতা। নিজেদের গুহায় বসে আছে।

'ফাহাদের কথা বাদ দাও,' আবার বললো সিহো, 'তোমার কথা বলো। তুমি খুশি হয়েছো? জবাব দাও, তুমি খুশি?'

চিতা

'হ্যাঁ,' গোঁ গোঁ করলো পুরুষ চিতা, 'আমি খুশি।'

'মেয়েটা খুব সুন্দরী, তাই না?' বললো সিহো।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দরী।'

'আমাদের দুজনকেই পছন্দ করে ফেলেছে সে। তোমার ব্যাপারে ভয় এখনো কাটেনি যদিও ওর। কিন্তু খেয়াল করেছো, শিকার থেকে ফিরলে তোমার দিকে কেমন তাকিয়ে থাকে সে যেন তোমারই অপেক্ষা করছিলো!'

'হ্যাঁ,' বললো পুরুষ চিতা, 'তাহলে তুমি ভাবছো

'ভাবাভাবির কিচ্ছু নেই। কেপু এখানে থাকবে।'

'সাবধান, ও যেন বাইরে বেরোতে না পারে।'

'নিজে নিজে বেরিয়ে যাবার সাহস এখনো হয়নি ওর

'কি হারে বাড়ছে দেখছো? দু'হপ্তায়ই কতো বড় হয়ে গেছে!'

'হবেই। ও তো আমাদের জাত নয়। এখনি ওর গায়ের জোর আমার সমান।'

আর কোনো কথা বললো না পুরুষ চিতা। আধ-চিবানো একটা হাড় নিয়ে চিবুতে লাগলো। গোঁ গোঁ করছে আপন মনে। প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সে। ভীতও। ফাহাদ এবং আর সব চিতা জেনে গেলে কি হবে। কি করবে। দু'হপ্তা ধরে বিজাতীয় একটা জীবের বাচ্চাকে লুকিয়ে রেখেছে, আর কতো!

রোজ শিকারে বেরোয় পুরুষ চিতা। একা কিংবা অন্য পুরুষদের সঙ্গে। ফাহাদের নির্দেশে দল বেঁধে চলে যায় অনেক

দূরে। বাড়ির জন্যে সবাই মাংস নিয়ে ফেরে। সে ফেরে অনেক বেশি মাংস নিয়ে, অন্তত দুজনের খাবার। ব্যাপারটা এখনো খেয়াল করেনি অন্য চিতারা, কিন্তু করবে। কৌতূহলী হয়ে উঠবে তারা।

'কি ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলো সিহো।

'ভাবছি...কেপু এখনো একেবারেই বাচ্চা,' হাড় চুষতে চুষতে বললো বাবা চিতা।

হ্যাঁ। তুমি যে মাংস নিয়ে আসো, কেবল চাটে সে। চিঁবোতে শেখেনি।'

'শিখতে বেশিদিন লাগবে না।'

'শিখে ফেললেই বা কি?' বললো সিহো। 'যতোদিন শিকার করতে না শেখে, তুমি জানোয়ার মেরে এনে দেবে। কিন্তু এখন ওসব ভাবছো না, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছো, এসব ভাবছি না,' গরগর করলো বাবা চিতা।

'তাহলে কি ভাবছো? বলো। আমরা সুখি, তাই না? কেপু আমাদের ভালোবাসে।'

'তা ঠিক,' বললো পুরুষ চিতা, 'এখন বাসে...কিন্তু, সিহো, একটা ব্যাপার ভুলে যেও না। শিগগিরই বুঝতে পারবে কেপু, ও আমাদের জাত নয়। বন থেকে এসেছে ও, বালির জগতের কেউ নয়। বনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে ও। বনে ওর জন্ম, বনের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক, বুঝতে ও পারবেই। ভাবছি,

যেদিন বুঝতে পারবে কেপু, সে চিতাদের কেউ নয়, কি করবে সেদিন।'

'কি বলতে চাইছো...'

'ঠিকই বুঝেছো তুমি, সিহো। না বোঝার মতো বোকা নও। ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চয় তুমিও ভাবছো?'

'না, ভাবছি না,' জবাব দিলো সিহো। অদ্ভুত একটা হিস হিস শব্দ বেরোলো মুখ থেকে। 'সে চিতা নয়, কে বলতে যাচ্ছে কেপুকে? হ্যাঁ? কে বলতে যাচ্ছে?'

'জানি না।'

'না বললে কিছু জানতেই পারবে না কেপু। জানবেই না বনে জন্ম হয়েছে ওর, আমরা ওর বাপ-মা নই। আমাদের সঙ্গে অনেক অমিল আছে চিতাবাঘের ভাষার। কেপু এখন আমাদের ভাষা শিখছে। তার মা তাকে কি শিখিয়েছিলো, ভুলেই যাবে। ওর বাবা তাকে শিকার শেখায়নি, তুমি শেখাবে। চিতার মতোই শিকার ধরতে শিখবে কেপু, চিতাবাঘের মতো নয়।'

'তা ঠিক।'

'তাহলে আর কিসের ভয়? কেপু এখন আমাদের মেয়ে।'

'সিহো, যদি সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়?'

'যাবে না। তুমি দেখে নিও, আমাদের ফেলে সে কখনো যাবে না। বনের কথা ভুলে যাবে, ভুলে যাবে সে চিতাবাঘ।... ওই যে, ফাহাদ ডাকছে। শিকারিদের ডাকছে। যাও, শিকারে

যাও।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'বেশি করে মাংস আনবে। চুষে ছিঁবড়ে বানিয়ে ফেললো আমাকে মেয়েটা। একদিনও দুধ খাইয়ে পেট ভরাতে পারি না। অতো দুধই হয় না আমার।'

কচি হরিণ শিকার করে আনে বাবা চিতা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয় সিহো। প্রথম প্রথম শুধু রক্ত চাটতো কেপু, এখন কামড়াতে শিখেছে। চিবিয়ে খেতে হয়, বুঝতেই পারে না।

তবে বুঝতে দেরি হলো না। শিগগিরই মাংস চিবিয়ে খেতে শিখলো কেপু। নখে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেও শিখলো।

দ্রুত বাড়ছে কেপু। গুহা থেকে বেরোতে গেলে এখনি তাকে হামাগুড়ি দিতে হয়। গুহাটা এখন খুব ছোটো মনে হয় তার কাছে। হাঁটতে গেলেই দেয়ালে ধাক্কা লাগে।

রাতের বেলা অধৈর্য হয়ে ওঠে কেপু। গুহায় থাকতে চায় না, কেবলই বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তাকে বেরোতে দিতে চায় না সিহো। কখনো কখনো বেশ চাপাচাপি শুরু করে কেপু। বাধ্য হয়েই জোর খাটাতে হয় তখন সিহোকে। চাপা গলায় গর্জাতে থাকে কেপু।

একদিন, ঘুমিয়ে পড়েছে কেপু। নিচু গলায় বললো বাবা

চিতা, 'এই গর্তে সারাজীবন বন্দি করে রাখতে পারবে না ওকে। একদিন না একদিন বেরিয়ে পড়বেই। অন্য চিতারা দেখে ফেলবে।'

'তার আগেই ওদেরকে দেখাবো আমি,' বললো সিহো।

'কিন্তু তুমি মা! আমাদের সমাজে বাচ্চাকে প্রথম বাইরে বের করে বাবা। এটাই নিয়ম।'

'তুমি বের করবে কি? ফাহাদের সামনে গেলে তো ভয়েই কাঁপো,' থুথু ছেটালো সিহো। 'আমিই নিয়ে যাবো কেপুকে। কথা বলবো ফাহাদের সঙ্গে।'

চুপ করে গেল বাবা চিতা। সিহো বলছে বটে, কিন্তু জানে সে, শিগগিরই ফাহাদের সামনে গিয়ে হাজির হতে হবে তাকে। সিহো মেয়েকে নিয়ে বাইরে বেরোবে, জানাতে হবে অন্য চিতাদের। হয়তো আজ বিকেলেই যেতে হবে, কে জানে।

জেগে উঠেছে কেপু। তার সঙ্গে কথা বলছে মা চিতা। এমন ভাবে, যেন কেপু এখনো আগের মতোই শিশু। খেয়ালই নেই, আকারে এখন তার চেয়ে বড় হয়ে গেছে পালিতা-মেয়ে।

'কেপু, আজই গুহার বাইরে নিয়ে যাবো তোমাকে। ভয় করছে না তো?'

'না,' ভারি গলায় বললো কেপু।

'সোজা ওদের চোখে চোখে তাকাবে।'

'তাকাবো।'

'অসুবিধে হবে না তোমার, চোখ মিটমিট করতে হবে না।

অন্ধকার হলে তবেই বেরোবো আমরা।'

গুহার অন্ধকারে বাস করে করে কেপু ভুলেই গেছে, দিনের আলো পীড়া দেয় তার চোখে, সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সিহো ভোলেনি।

শেষ বিকেল। রাতের আর বেশি বাকি নেই। বাইরে বেরোনোর জন্যে মেয়েকে তৈরি করে নিতে লাগলো সিহো। চেটে সাফ করে দিলো কেপুর মুখের ধুলো ময়লা। পরিষ্কার করে দিলো সারা গা। এদিক থেকে ওদিক থেকে দেখে বললো 'বাহ্, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

এই প্রথম ভাবলো সিহো, এতোদিন লুকিয়ে রেখে বোকামিই করেছে। ঝোপ তার ছেলে নিয়ে মেয়ে দিয়েছে। সুন্দর মেয়ে! ওকে কেন লুকিয়ে রেখেছে সে? কেন লুকিয়ে রাখবে?

বাইরে সাঁঝ হলো। রাত নামলো। মেয়েকে নিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো সিহো। গুহামুখের কাছে বসলো। পাহাড়ের নিচ থেকে ভেসে আসছে বাচ্চা-চিতাদের হৈ-চৈ। খেলছে ওরা। ওদের কাছাকাছিই বসে আছে বয়স্করা। কথা বলছে ভারি গলায়। ওখান থেকে কেপু আর সিহোকে দেখতে পাবে না ওরা।

পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর কেপুকে নিয়ে উঠলো মা। নিচে তাকালো। হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে বড়রা। কোনো জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছে মনে হচ্ছে। বাবা চিতাও

আছে ওখানে।

'কে-পু! কে-পু!' হঠাৎ মিষ্টি গলায় ডেকে উঠলো কেউ। ফিরে চাইলো কেপু। আরে! তার বন্ধুরা এখনো আছে! পাহাড়ের মাথায় একটা ক্যাকটাস গাছে বসে আছে লাল পাখিরা।

কেপুর কাছে নেমে এলো পাখিরা। অনেক দিন পর আবার রাজকুমারীকে পেয়েছে। খেলায় মেতে উঠলো। পাশে বসে দেখতে লাগলো সিহো।

'সিহো!'

ডাকটা এতোই হঠাৎ এলো, চমকে উঠলো সিহো। ফিরে তাকালো। তার সঙ্গী। উঠে আসছে চ্যাপ্টা পাথরটার ওপরে।

'সিহো,' আবার বললো বাবা চিতা। 'আমাদেরকে নিয়েই আলোচনা করছে ওরা।'

'কি বলছে?'

'কি জানি বলাবলি করছিলো। আমি যেতেই চুপ হয়ে গেল।'

'ফাহাদের সঙ্গে কথা বলেছো?'

'না।'

'তাহলে আমি বলবো।'

'না! উচিত হবে না, সিহো!'

'কেন?'

'ও আমাদের মেয়ে নয়। অন্য জীবের সন্তানকে পেলে বড়

করছি...

'কাজটা কি অন্যায় করছি ?'

'না, তা নয়, সিহো। তবে···

'তবে কি ?'

চুপ করে গেল বাবা চিতা। আস্তে করে বললো, 'না, তর্ক করে লাভ নেই! বুঝতে পারছি, তুমি হার মানবে না !'

'না, মানবো না !' চাপা গরগর শব্দ বেরোলো সিহোর গলা থেকে।

বাবা চিতাকে দেখে আবার উড়ে গিয়ে গাছে বসেছে লাল পাখিরা। ওদের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে কেপু। জেগে জেগেই কিসের স্বপ্ন দেখছে যেন।

'ওকে শুনিয়ে বলা উচিত না,' নিচু গলায় বললো বাবা চিতা। 'কখনো জিজ্ঞেস করেনি, কেন তাকে গুহার বাইরে নিয়ে যাও না ?··· সিহো, ওর চোখ দুটো দেখেছো ! কিছু একটা ভাবছে, হয়তো মনে করার চেষ্টা করছে। সব সময়ই ওরকম বিষণ্ণ হয়ে থাকে ও !'

'কেপু, এসো গুহায় ফিরে যাই,' ডাকলো মা চিতা।

ফিরে চাইলো কেপু। উঠলো না।

'কেপু, ওরকম মন খারাপ করে থেকো না। এসো, যাই।'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কেপু। হঠাৎ চলে গেল বিষণ্ণ ভাবটা। মাথা সোজা করে দাঁড়ালো। জেগে উঠেছে যেন আঁধারের কন্যা, বাউ জঙ্গলের গর্বিত রাজকুমারী।

'দেখলে সিহো, কেমন হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন আসে ওর মাঝে!' বললো বাবা চিতা। 'ওকে গুহায় বন্দি করে রাখা যাবে না আর! বেশি দিন এভাবে থাকলে...'

'ওসব ভেবেছি আমি আগেই!' বাধা দিয়ে বললো সিহো।

'ভেবেছো আমাদের এখানে থাকা চলবে না?' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে বাবা চিতার।

'হ্যাঁ। এ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবো আমরা কেপুকে নিয়ে।'

'ওরা আমাদের তাড়িয়ে দেবার আগেই...'

কেপুকে নিয়ে গুহার দিকে চললো সিহো। আগে আগে চলেছে কেপু। পেছনে সিহো, পাশে বাবা চিতা।

চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো মা-বাবা। কান খাড়া করলো।

'শুনছো!' বললো বাবা চিতা।

'ফাহাদের গলা।'

'এদিকেই আসছে!'

'আসুক।'

'ও একা নয়!'

এক লাফে কেপুর পাশে চলে এলো সিহো। দরকার পড়লে পুরো দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। রক্ষার চেষ্টা করবে মেয়েকে। বিনা লড়াইয়ে মেয়ের গায়ে আঘাত করতে দেবে না ওদেরকে কিছুতেই। দ্রুত মেয়েকে নিয়ে গুহার দিকে এগোলো সে। ফাহাদ আর দলবল আসার আগেই

পৌঁছে গেল গুহামুখে। ধাক্কা দিয়ে মেয়েকে ঢুকিয়ে দিলো সুড়ঙ্গের ভেতর। নিজেও ঢুকে গেল।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে রইলো বাবা চিতা। শুনছে।

এক সঙ্গে কথা বলছে অনেকে। ওদের মাঝ থেকে শোনা গেল ফাহাদের ভারি গলা, 'চুপ, সবাই চু-প! আমার কথার ওপর কথা! এতো সাহস! বুড়ো হয়েছি, তাই বলে গায়ের জোর কমেনি। কারো সন্দেহ থাকলে দেখতে পারো এসে!' চুপ হয়ে গেল সবাই। আবার শোনা গেল ফাহাদের গলা, 'কিছু একটা আছে সিহোর গুহায়, কথাটা আমার কানেও এসেছে। ও ছেলে হারিয়েছে...ছেলে দুর্বল, তাই সাজা পেতে হয়েছে মাকে...নিশ্চয় এখনো শোক ভুলতে পারেনি মেয়েটা! চুপচাপ গুহায় শুয়ে থাকে, বেরোয় না। ...তোমাদের আসার দরকার নেই। যার যার গুহায় ফিরে যাও। আমি দেখে আসি কি হয়েছে! কাল জানাবো তোমাদের...'

তাড়াতাড়ি এসে গুহায় ঢুকলো বাবা চিতা। 'ও আসছে!'

'ফাহাদ?'

'হ্যাঁ!'

'ভালো। আমি কথা বলবো।'

'দোহাই তোমার, সিহো, ওর সঙ্গে মেজাজ দেখিও না। মনে রেখো, ফাহাদ আমাদের নেতা। প্রভু।'

'ও তোমার প্রভু হতে পারে, আমার নয়। ...ঠিক আছে মেজাজ দেখাবো না। কেপু, আমার কাছাকাছি থাকো।'

গুহায় এসে ঢুকলো ফাহাদ। বয়সের ভারে সামান্য নুয়ে পড়েছে। ধূসর চামড়া। কিন্তু ভারিক্কি ভাবটা কমেনি এক বিন্দু। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। চোখে অন্ধকার সইয়ে নিলো, আগের মতো ভালো দেখতে পায় না আর এখন।

'তোমাকে দেখতে এসেছি, সিহো,' গম্ভীর গলায় বললো ফাহাদ।

'আমার সৌভাগ্য।'

কেপুর দিকে তাকালো ফাহাদ। দীর্ঘ এক মুহূর্ত দেখলো। 'ওকে নিয়েই আছো তাহলে?'

'ওকে নিয়েই আছি।'

'মেয়ের নাম কি রেখেছো, সিহো?'

'কেপু।'

'সুন্দর। কিন্তু চিতারা তো এরকম নাম রাখে না।'

'চিতাবাঘের নাম।'

'সিহো, আমি তোমার বন্ধু হয়ে এসেছি।'

'বন্ধু!' গোঁ গোঁ করে উঠলো মা চিতা।

'হ্যাঁ। শুধু তাই না, তুমি আমার মেয়ের মতো। আর সব মেয়ে চিতাদের চেয়ে তুমি আলাদা। তোমাকে নিয়ে গর্বই হয়। পরাজয় স্বীকার করতে জানো না। কিন্তু সমাজের নিয়ম মানোনি তুমি। এর জন্যে তোমাকে শাস্তি দিতে পারে সমাজ, জানো?'

বাধা দিয়েও সিহোকে থামাতে পারলো না বাবা চিতা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো সিহো, 'সমাজ! নিকুচি করি সমাজের! যে সমাজ মায়ের বুক খালি করে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, থুথু দিই ওই সমাজের মুখে! ফাহাদ, তুমি বুড়ো হয়েছো। চোখে ভালো দেখতে পাও না। ভালো করে তাকাও আমার মেয়ের দিকে। এতো সুন্দরী মেয়ে এর আগে দেখেছো? আছে তোমাদের সমাজে? ওই মেয়ের জন্যে আমি...'

'আস্তে কথা বলো, সিহো,' শান্ত কণ্ঠে বললো ফাহাদ।

'কেন আস্তে বলবো? তোমাদের ওই নিষ্ঠুর সমাজের ভয়ে? ওরা আমার ছেলেকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছে। আমার কান্না সইতে পারেনি ঝোপ। ছেলে নিয়েমেয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু চিতা সমাজ তো তাকে আপন করে নেবে না।'

'না নিক। ওই সমাজকে মানি না আমি।'

চুপ করে রইলো ফাহাদ। সিহোকে শান্ত হওয়ার সময় দিলো। চুপ করে আছে বাবা চিতা। কেপুও চুপ। কি ঘটছে, আসলে বুঝতেই পারছে না সে।

'সিহো,' বললো ফাহাদ, 'আগেই বলেছি, আমি তোমার বন্ধু হয়ে এসেছি। বুড়ো হয়েছি, অনেক দেখেছি জীবনে, অনেক শিখেছি। তুমি আমাকে শত্রু ভাবছো, সিহো, কিন্তু আমি সাহায্য করতেই এসেছি।'

'সাহায্য করতে?'

'হ্যাঁ। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, চাইলে মানতে পারো। অনেক বড় এই মরুভূমি। আমাদের এলাকার বাইরে অনেক অনেক

দুর ছড়িয়ে আছে...'

'ছড়িয়ে আছে!' ফাহাদের কথার যেন প্রতিধ্বনি করলো সিহো।

'ওদের সবাইকে একা আমি ঠেকাতে পারবো বলে মনে হয় না। ওরা এখনো জানে না, কি আছে তোমাদের গুহায়। তা-হলে হয়তো আজই ফেরাতে পারতাম না। তোমাদের আর এখানে থাকা উচিত হবে না···

'শুনলে তো, সিহো?' বলে উঠলো বাবা চিতা।

হ্যাঁ। আমি তৈরি।'

'ভুল বুঝো না, সিহো। তোমাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি না,' বললো ফাহাদ। 'পরামর্শ দিচ্ছি শুধু। তোমার মেয়েকে বাঁচাতে চাইছি।'

'আজ রাতেই...,' বলতে গিয়ে বাধা পেলো সিহো।

'ভোরের আগেই,' বললো বৃদ্ধ নেতা। 'সারা গাঁ তখন ঘুমিয়ে থাকবে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা।

'মরুভূমি অনেক বড়···' আবার বললো ফাহাদ। 'বিদায়!'

ঘুরে দাঁড়ালো বৃদ্ধ চিতা। ফিরে চাইলো একবার। কেপুকে দেখলো। আবার বললো, 'বিদায়!' বেরিয়ে গেল সে গুহা থেকে।

কেন কি ঘটলো, কিছুই বুঝতে পারলো না কেপু। শুধু এটুকু বুঝলো, ওরা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। এই ছোট্ট

গুহার বাস তাদের উঠেছে। রাতের ডাকে সাড়া দিয়েই হয়তো এখান থেকে চলে যাবে ওরা, আর কোনো দিন ফিরবে না। এতে দুঃখিত নয় কেপু। বরং হঠাৎ কেমন আনন্দই বোধ করলো। ছলকে উঠলো বুকের রক্ত। মুক্তি পেতে যাচ্ছে সে। এই বদ্ধ খাঁচা থেকে মুক্তি...

খুশি হয়ে উঠলো কেপু, খেয়ালই করলো না, বিষণ্ণ হয়ে গেছে তার পালক-পিতার চেহারা। এতোদিন যেখানে বাস করেছে, সেই গুহা, গাঁ ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হবে তার। কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশের পথে রওনা হবে ওরা জানে না। একা থাকতে অভ্যস্থ নয় চিতারা, আলাদা বাস করছে কোনো চিতা-দম্পতি এটা ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে।

রাত বাড়ছে, উতলা হয়ে উঠেছে কেপু। কিন্তু ফাহাদ বলে গিয়েছে, ভোরের আগে। সময় হলো। আগে আগে চললো সিহো। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ওরা গুহার বাইরে। কেউ নেই আশেপাশে, একেবারে শূন্য। পাহাড়ের মাঝের একটা ফাটল দিয়ে ওপাশে বেরোতে হবে। ফাটলের এক পাশে পাহাড়ের মাথায় বিশাল এক চ্যাপ্টা পাথর। পাহারাদার থাকে ওখানে..

'কেউ থাকলে ওখানেই থাকবে...' সিহোর কানে কানে বললো বাবা চিতা। 'যদি দেখে ফেলে? অন্য চিতাদের ডাক দেয়?'

'ক্যাকটাসের ছায়ায় ছায়ায় চলে যাবে ফাটলের কাছে,'

বললো সিহো।

ফাটলের মুখের কাছে চলে এলো ওরা। ওপর দিকে তাকালো বাবা চিতা। একটা ছায়া সরে গেল বলে মনে হলো ওর।

ফাটলে ঢুকে পড়লো বাবা চিতা। সরু ফাটল, হাঁটতে গেলে ঘষা লেগে যায়। এক সারিতে এগোলো ওরা। বেরিয়ে এলো ওপাশে। খুব খুশি কেপু। অন্ধকার রাত। খোলা আকাশ। বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিচ্ছে সে। সামনে বিছিয়ে আছে বিশাল মরু, যতদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি।

এগোলো ওরা। পেছনে ফেলে এলো ক্যাকটাসের সারি। ফিরে তাকালো বাবা চিতা, জন্মভূমিকে শেষ বারের মতো দেখতে চায়।

হ্যাঁ, আছে, পাহারাদার আছে পাহাড়ের মাথায়। কালো আকাশের পটভূমিতে ধূসর চামড়ার রঙ।

'ফাহাদ!' নিচু গলায় বললো বাবা চিতা।

ফিরে চাইলো সিহো। সে-ও দেখতে পেলো।

গাঁয়ের কাউকে বিশ্বাস করেনি ফাহাদ। নিজেই পাহারায় রয়েছে। মেয়েকে নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাক সিহো, এই চাইছে বৃদ্ধ নেতা। গুহা থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম মনটা কেমন করে উঠলো সিহোর।

নয়

দুস্তর মরু

বালির ওপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মোড় নিলো বাবা চিতা। সামনে বালির পাহাড়, তার ওপাশে আঠা গাছের জঙ্গল। সেদিকে এগিয়ে চললো।

জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালো সিংহো। না, সেদিকে যাবে না। উল্টো দিকে ফিরলো। বাধ্য হয়েই বাবা চিতাকেও ফিরতে হলো।

শুকনো একটা নদীর ধারে চলে এলো ওরা। কোনো আদিম যুগে পানি ছিলো ওই নদীতে, কবে শুকিয়ে মরে গেছে জানে না কেউ। মরা নদীর ধার ধরে ধরে এগোলো দলটা।

কোনো রহস্যজনক কারণে উদ্ভিদকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারেনি এখানে বালি আর সূর্য। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গজিয়ে আছে কয়েকটা সরু পাম গাছ। গাছগুলোর পর থেকেই শুরু হয়েছে পাথরের মরুভূমি, বিশাল রেগ।

এগিয়েই চললো ওরা একনাগাড়ে। ফাহাদের গাঁ থেকে

অনেক দূরে সরে চলে এসেছে, আরো দূরে সরে যেতে চায়। তারপর কোনো পাথরের পাহাড়ে সুবিধেজনক একটা গুহা খুঁজে বের করবে। ফাহাদের দলের কারো সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাক, মোটেই চায় না সিহো।

'দরকার হলে পুরো রেগ খুঁজে দেখবো আমরা,' এক সময় বললো বাবা চিতা। 'ভালো গুহা কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবেই।'

দুটো দিন একনাগাড়ে এগোলো ওরা। শেষ নেই যেন এই মরুভূমির। মানুষ চলাচলের চিহ্ন নেই, আসে না এদিকটায়। জন্তুজানোয়ার আছে, তবে যারা পানি ছাড়া অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে, তারাই এখানকার অধিবাসী। গ্যাজেল হরিণ, অরিক্স হরিণ লম্বা—পেঁচানো, তলোয়ারের মতো চোখা শিং, অতি সাবধানী অ্যাডাক্স হরিণ, ঘাসের ওপর পড়ে থাকা শিশির-ই এদের জন্যে যথেষ্ট। উট পাখিও বাস করে এ অঞ্চলেই।

যৌবনে এদিকে শিকারে এসেছিলো বাবা চিতা, মনে করতে পারছে।

দুই দিনের দিন রাতে, জীবনে প্রথম সত্যিকারের শিকার করলো কেপু।

বয়েস হয়েছে, আগের মতো আর ক্ষমতা নেই শরীরে, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বাবা চিতা। কেপুকে শিকার ধরতে সাহায্য করলো সিহো। হাল্কা কুয়াশার পর্দা যেন ঝুলে আছে পাথুরে মরুর বুকে। এরই মাঝে চোখে পড়লো ওদের, দূরে

কয়েকটা গ্যাজেল হরিণ চরছে। তাড়া করলো সিহো আর কেপু। কাছাকাছি গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো সিহো। বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ একটা ডাক ছাড়লো, মেয়েকে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইঙ্গিত ওটা। ঝাঁপিয়ে পড়লো কেপু। দাঁত বসিয়ে দিলো হরিণের গলায়। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করলো সে।

হরিণটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো ওরা। দেখতে দেখতে খেয়ে শেষ করে ফেললো। প্রচুর খেলো, তবু পেটে খিদে রয়েই গেল কেপুর।

পরদিন, ছোট্ট একটা ডোবার ধারে এসে পৌঁছুলো ওরা। পানি ছিলো ওটাতে এক সময়, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখন নেই। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলো কেপু। নেমে গেল ডোবায়। শুকনো মাটিতে নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করলো।

'কি করছে!' সিহোর দিকে চেয়ে বললো বাবা চিতা।

'জানি না!'

নখ দিয়ে আঁচড়ে ছোটো একটা গর্ত করে ফেললো কেপু। নাক নামিয়ে শুঁকলো। তারপর আবার আঁচড়াতে লাগলো। ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছে গর্তটা। আবার শুঁকলো কেপু। কিন্তু না, পাওয়া গেল না। অনেক বছর আগে এখানকার কাদা শুকিয়ে গেছে।

এই কাজ কেপুর বাবা আবগা করেছে, মা চিরণ্ড করেছে। কাউকে শিখিয়ে দিতে হলো না, অবচেতন মনই বলে দিয়েছে

কেপুকে : ওখানে খোঁজো। মাগুর মাছ পাওয়া যেতে পারে।

আরো খানিকটা খুঁড়েই বুঝে গেল কেপু, এখানে মাছ পাওয়া যাবে না। উঠে এলো সে ডোবা থেকে।

আবার এগিয়ে চললো ওরা। বিকেলের দিকে একটা বালির পাহাড় পেরোলো। বিশাল পাথুরে মরুর শেষ প্রান্ত এটা। সামনে কয়েকটা পাহাড়, পাথরের। সেদিকে এগোলো ওরা। পায়ের তলায় চোখা পাথর, নরম মাংস কেটে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু তবু থামলো না তিন অভিযাত্রী।

একটা পাহাড়ে এসে উঠলো ওরা। ওপাশে মরূদ্যান। সবুজ ঘাসকে ঘিরে জন্মেছে বেশ কিছু পাম গাছ।

'এখানেই থামবো আমরা,' বললো বাবা চিতা। 'জায়গা-টা চিনি। অনেক অনেক দিন আগে শিকারে এসেছিলাম এখানে।'

'গাছগুলো সত্যি আছে,' দিগন্তের দিকে চেয়ে বললো সিহো।

'হ্যাঁ, আছে,' জবাব দিলো বাবা চিতা। 'মরীচিকা নয় পানিও আছে ওখানে। ওগলাট—বেশ বড় একটা ডোবামতো। বছরের সব সময়ই পানি থাকে।'

'বেশ, চলো,' বললো সিহো।

মরূদ্যানের দিকে এগোলো ওরা। একপাশে গ্র্যানাইটের পাহাড়। জনপ্রাণীর ছায়াও নেই কোনোদিকে। পাশ ফিরলো বাবা চিতা। পাহাড়ে উঠবে।

এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর, ঝোলা-বারান্দার মতো। পাথরের সামান্য ওপরে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গর্ত, সুড়ঙ্গমুখ। নিশ্চয় গুহা আছে সুড়ঙ্গের শেষে। বারান্দায় বসে তিন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।

'এটাই আমাদের জায়গা,' বললো বাবা চিতা।

ঝোলা বারান্দায় উঠে এলো ওরা। ধূসর গ্র্যানাইটের পাহাড়। একটা গুহায় ঢুকে পড়লো বাবা চিতা। ভেতরটা দেখে বেরিয়ে এলো। তারপর ঢুকলো সিহো আর কেপুকে নিয়ে।

বড়সড় গুহা। প্রচুর জায়গা। খুব পছন্দ হলো সিহোর।

নতুন গুহায় প্রথম রাত ভালোই কাটলো ওদের।

সুখেই দিন কাটছে কেপুর। বাউ জঙ্গলে কাটিয়ে আসা দিনগুলোর মতোই সুখের। মাঝেমধ্যে অতি আবছাভাবে মনে পড়ে যায় তার শিশুকালের কথা।

বিশাল এক রাজ্যে রাজত্ব করছে ওরা। পাথরের পাহাড়, পাথরের মরুভূমি, সবুজ মরূদ্যান, নীল আকাশ, শুকনো নদীখাত আর অগুণতি জন্তুজানোয়ার। কি সুন্দর এক দেশ!—কেপুর তা-ই মনে হয়।

একসঙ্গে শিকারে বেরোয় ওরা, শিকার ধরে। কখনো ভোরের সোনালি আলোয়, কখনো গোধূলির সবুজ ছায়ায়। এখানকার জন্তুজানোয়ারেরা সবাই খুব দ্রুত ছুটতে পারে,

মরুর দমকা বাতাসের চেয়েও দ্রুত।

'ওই যে, অরিক্স,' চাপা গলায় বলে সিহো। ওর নজরই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। দিনের আলোয় ভালো দেখতে পায় না কেপু, বিশেষ করে দূরের শিকার। চোখের সামনে আঁকাবাঁকা কতগুলো রেখা শুধু ফুটে ওঠে।

'বিশ্রাম করছে ওরা, না?' বলে কেপু।

চিতার সাড়া পেলেই লাফিয়ে উঠে ছুটবে হরিণের দল, বাতাসের আগে আগে। তখন ধরা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এগোতে হয় সাবধানে, চুপিসারে। কাছাকাছি পৌঁছে কোনো পাথরের আড়াল থেকে হঠাৎ লাফিয়ে পড়তে হয় ঘাড়ে।

আশ্চর্য! অন্ধকারের জীব কেপু, দিনের আলোকে সহ্য করে নিতে শিখেছে। মরুর রোদকেও পরোয়া করে না সে এখন, চিতাদের মতোই। দুপুরের কড়া রোদেও শিকার ধরতে পারে, চোখে একটু অসুবিধে হয় এই যা।

কোনো অলস সকালে খেলার ছলেই উট পাখিদের তাড়া করে কেপু। পাখা নেই, কিন্তু তবু ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারে না চিতাবাঘের বাচ্চা। মরুর ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলে যায় ভারি পাখিগুলো, মাটি ছোঁয় না যেন পা। চিতাবাঘ তো দূরের কথা, সবচেয়ে দ্রুতগামী জানোয়ার চিতারাও দৌড়ের পাল্লায় পেরে ওঠে না ওই আজব পাখির সঙ্গে।

মুখ-ঢেকে-রাখা মানুষের দেখা পেলো একদিন কেপু। বিশাল এক পাথরের স্তূপের আড়ালে বসে আছে সে।

দিগন্তের ওই যেখান থেকে সূর্য উঠে আসে, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো দলটা। হাজার হাজার উট। পিঠে বড় বড় বস্তা। মানুষজন কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা উটের পিঠে চেপে চলছে। একটা বালির পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে গেল ওরা। শুধু উট না, আরো জানোয়ার আছে কাফেলায়। গাধা আছে, ঘোঁড়া আছে। বড় দুটো ঘোড়ার পিঠে মানুষ সওয়ারীর পেছনে দুটো চিতাও সওয়ার হয়ে চলেছে। ধরে পোষ মানিয়ে নিয়েছে ওরা। ও দুটোর সাহায্যে শিকার ধরে এখন।

হেলেদুলে বালির মেঘ উড়িয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেল দলটা। লবণ ব্যবসায়ী আজালাইদের কাফেলা।

পালক-বাবা-মায়ের সঙ্গে বেশ শান্তিতেই দিন কাটছে কেপুর। ঠিকই আন্দাজ করেছিলো সিহো: নিজে কোন জাতের, কে বাবা-মা, জানতে চাইবে না কেপু। জঙ্গলের কথাও ভুলে যাবে।

'দেখলে তো?' একদিন বাবা চিতাকে বললো সিহো। 'ও কোনোদিন জঙ্গলের কথা মনে করবে না। কেপু এখন আমাদেরই মেয়ে। আমরা ভালোবাসি, আমাদেরকেও ভালোবাসে ও।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'মানেও আমাদের।'

'হ্যাঁ।'

'বুড়ো বয়েসে তোমার খাটুনি কতো বাঁচিয়ে দিচ্ছে, দেখেছো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু···

'আবার কিন্তু কি?'

'মানে, রাতের বেলা...'

'রাতে আবার কি করলো?'

'কেন, খেয়াল করোনি!···জেগে জেগেই কিসের স্বপ্ন দেখে ও।'

'খেয়াল করেছি··· ' চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করলো সিহো।

'গভীর ঘুমের মাঝেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ও। পায়চারী করতে থাকে গুহার ভেতর। সিহো, ও আঁধারের জীব, আঁধার ওকে ডাক দিয়ে যায়। চিতাবাঘের মেয়ে তার পূর্ব-পুরুষের স্বভাব ভুলবে কি করে?'

চুপ করে রইলো সিহো। চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'যতো যা-ই করুক,' অনেকক্ষণ পরে বললো সিহো, 'আমাদের মেয়ে···ওকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা, গর্ব...'

'হয়তো।···কে জানে!' বিড়বিড় করলো বাবা চিতা।

দিন যায়। হপ্তা যায়। যায় মাস। এই সময় একদিন আনন্দের বান ডাকলো ছোট্ট পরিবারটাতে। সিহোর বাচ্চা হলো, ছেলে-চিতা। ভাইকে খুব পছন্দ হয়ে গেল কেপুর। রোমশ নরম একটা চামড়ার বল যেন! মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাটাকে দখল করে নিলো কেপু। শুধু দুধ খাবার সময় ছেলেকে কাছে পায় সিহো, বাকি সময় কেপুর কাছেই থাকে।

'যাক, একটা বড় দুঃশ্চিন্তা গেল,' বললো বাবা চিতা।

ছেলেটাকে মোটেও হিংসা করছে না কেপু।'

'কেন করবে ? ও বড় হয়েছে না ?' বললো সিহো।

ছোট্ট ভাইটাকে কখনো চোখের আড়াল করে না কেপু। দাঁড়াতে শিখলো চিতাশিশু। ছোটো ছোটো পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টলতে টলতে। তাকে সাহায্য করলো কেপু। হাঁটতে শেখালো। চিরগু একদিন যেমন করে কেপুকে জন্তু-জানোয়ারের নাম শিখিয়েছিলো, ভাইকে তেমনি করে শেখাতে লাগলো ও।

সিহোর আনন্দের সীমা নেই। কেপু তার ছেলেকে পছন্দ করছে। ওই ছেলেটাকে কেউ আর ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বনে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে না।

ফাহ'দের গোত্রের মতো নিষ্ঠুরতা নেই সিহোর গোত্রে। এখানে শুধুই ভালোবাসা।

একদিন বাইরে থেকে ভিজে চুপচুপে হয়ে ফিরে এলো বাবা চিতা। জানালো, বৃষ্টি নেমেছে। সবুজ হয়ে উঠবে আবার ঘাস।

'দেখেছো ?' গুহার কোণে খেলছে কেপু আর তার ছেলে, সেদিকে চেয়ে বললো সিহো। 'দুটিতে কেমন ভাব ?'

'কতো বছর পর বৃষ্টি নামলো ! ফাহাদের গাঁয়ে এখন...' বলতে বলতেই থেমে গেল বাবা চিতা। সিহো তার কথা শুনছে না।

'এই একটু আগে কেপু কি করেছে জানো ?' বললো সিহো।

'কি করেছে ?'

'আন্দাজ কর তো ? না, পারবে না। ওর বন্ধু লাল পাখি-গুলোকে চেন...'

'চিনি।'

'ভাইকে তুলে নিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলো কেপু। ওর বন্ধুদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিয়েছে।'

'ছেলেটাও বেশ দুষ্টু হয়েছে।'

'এবং ভারি। ওকে ওঠাতে আমারই বেশ কষ্ট হয়। অথচ কি সহজে মুখে তুলে নিয়ে চলে গেল কেপু! সত্যি, অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা।'

কেপুর লাল পাখিরা এখানেও এসেছে। ক্যাকটাস গাছে বাসা বানিয়েছে ওরা। সুখেই আছে।

দিন যায়।

মরুভূমির বর্ষা, এলো আর গেল। কিন্তু ও-ই যথেষ্ট। মরুর জন্তুজানোয়ারের মতোই উদ্ভিদরাও খুব কম পানিতে চালিয়ে নিতে পারে। ঘন হয়ে জন্মালো স্বট ঘাস, আবার সবুজ হয়ে উঠলো। ফুল ফুটলো কাঁটাক্যাকটাসে। বাতাসে অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

দলে দলে এসে হাজির হলো মরুর হরিণ। দিন কয়েক খুব আরামে শিকার করে বেড়ালো চিতা-পরিবারটা। শিকারে বেরোয় বাবা আর মা, ভাইকে নিয়ে গুহার বাইরে বারান্দায়

বসে থাকে কেপু। কখনো বাবা-মা ছেলেকে নিয়ে বসে থাকে, কেপু যায় শিকারে। প্রচুর মাংস নিয়ে আসে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঠেলে দেয় ভাইয়ের দিকে।

মাংস খেতে শেখেনি এখনো চিতাশিশু। হাড়-মাংসে লেগে থাকা রক্ত চাটে কেবল। দাঁত উঠলো। শিগগিরই মাংস চিবিয়ে খেতে শিখে গেল সে।

ভাইয়ের সঙ্গে কুস্তি লড়ে কেপু। এতে মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠলো চিতাশিশুর।

রাতে বোন আর মায়ের মাঝখানে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমায় ছেলেটা। মায়ের চেয়ে বোনকেই বেশি পছন্দ করে সে, ঘুমানোর সময়ও তার কাছ ঘেঁষে আসে।

বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বাবা চিতা। কানে ভালো শোনে না এখন, চোখেও আগের মতো দেখে না। মাঝেমধ্যে ঘুমের ঘোরেই উঠে পড়ে কেপু। বাইরে চাঁদ উঠলে বেরিয়ে যায় গুহা থেকে। কেমন উদাস হয়ে যায়। সিহো খেয়াল করে, কিন্তু বাবা চিতা করে না। বলি বলি করেও বলে না সিহো। বাবা চিতার অস্বস্তি বাড়াতে চায় না।

এতোই নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় কেপু, ছেলেটা না থাকলে সিহোও জানতো না। ঘুমের ঘোরে বোনকে খোঁজে ছেলেটা, না পেয়ে মায়ের পেটে আঁচড় কাটতে থাকে। জেগে উঠে দেখে মা, কেপু গুহায় নেই।

সিহো জানে না, অতীতের কিছু রঙিন স্মৃতি ফিরে আসতে

শুরু করেছে কেপুর মনে। চাঁদের দিকে চেয়ে বসে বসে কল্পনা করে কেপু: বাউ জঙ্গলে ঝরাপাতার মর্মর, ক্রি নদীর কুলু-কুলু, সাভান্নার দিক থেকে ভেসে আসা আক্রান্ত জানোয়ারের শেষ আর্তনাদ যেন কানে এসে বাজে তার।

মনে পড়ে যায় ডালপাতার বিছানায় শুয়ে আছে কেপু, মাথার ওপরে ডাকাডাকি করছে লাল-পাখিরা, দু'পাশে বিশাল দুই চিতাবাঘ...কারা ওরা? ঠিক মনে করতে পারে না সে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন বিশাল মরুর বুকে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে উঠে কেপু। অস্থির ভাবে পায়চারী করতে থাকে...

ঘুম আর হয় না সিহোর। চুপচাপ শুয়ে থাকে। অপেক্ষা করে কেপুর। কিন্তু মেয়ে আর আসে না, আসে না। ভোরের দিকে হয়তো চোখ লেগে আসে মায়ের। চোখ মেলে দেখতে পায়, ভাইয়ের পাশে শুয়ে আছে কেপু। নিঃশব্দে কখন এসে শুয়ে পড়েছে মেয়েটা তার জায়গায়, বাবা-মা কেউই টের পায় না। ভাবনা বাড়তে থাকে মায়ের।

দিন যায়। বেড়ে উঠছে সিহোর ছেলে। গায়ের জোর বাড়ছে, পেশী শক্ত হচ্ছে। ছেলের দিকে চেয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠে মায়ের।

একদিন বিকেলে, গুহায় শুয়ে বিশ্রাম করছে দুই চিতা। কেপু আর তার ভাই নেই ঘরে, ক্যাকটাস বনে গেছে লাল পাখি-দের সঙ্গে খেলতে।

'শুনছো ?' বললো সিহো।

তন্দ্রার ঘোরেই গোঁ গোঁ করে উঠলো বাবা চিতা। ভীষণ ক্লান্ত। সকালে একটা হরিণকে তাড়া করে অনেক দূর চলে গিয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত ধরতে পারেনি। অনেক পথ হেঁটে খালি-পেটে গুহায় ফিরেছে। কেপুর শিকার করে আনা মাংস খেয়ে মাত্র শুয়েছে। জীবনে এই প্রথম শিকার হাতছাড়া হলো বাবা চিতার।

'শুনতে পাচ্ছো ?' আবার বললো সিহো।

'হ্যাঁ, বলে যাও,' চোখ না খুলেই বললো বাবা চিতা।

'ছেলেটার কথা বলছিলাম।'

'ওর আবার কি হলো ?'

'না না, তেমন কিছু না। তবে...'

'তবে ?' চোখ মেললো বাবা চিতা।

'মানে, বলছিলাম কি,' দ্বিধা করলো সিহো, 'ওটা বেজায় বেয়াড়া হয়েছে। কাউকে মানতে চায় না, কেপুকে ছাড়া...'

'তাতেই বা কি হয়েছে ?'

'না, কিছু হয়নি...,' আবার দ্বিধা করলো সিহো। 'কেপু... কেপু শিকারে বেরোয় রাতের বেলা...'

'জানি...' আবার চোখ মুদলো বাবা চিতা।

'ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যায় সে।'

'কি বললে ?' ঝট করে মাথা তুললো বাবা চিতা। পুরো-পুরি সজাগ। 'অসম্ভব। রাতে ভালো দেখতেই পায় না

চিতারা...'

'কিন্তু ছেলেটা যাচ্ছে।'

'অন্ধকারে···কিন্তু কি করে!'

'কিভাবে, কি করে, জানি না! কিন্তু ছেলেটা রোজ রাতেই বেরিয়ে যায় বোনের সঙ্গে। অন্ধকারেই শিকার ধরে। ছেলে-টাকে চিতাবাঘের মতো করে শিকার ধরতে শিখিয়েছে কেপু।"

'হুঁ!' আবার মাথা নামালো বাবা চিতা। 'ভালোই। দিনে-রাতে সব সময়ই শিকার করতে পারবে...' চোখ মুদলো আবার সে।

অস্বস্তি দুর হয়ে গেল সিহোর। বাবা চিতা সহজভাবেই গ্রহণ করেছে ব্যাপারটাকে।

দশ

বন্দিনী

'দেখো,' বললো কেপু।

বিশালদেহী বোনের মতোই চোখ মেলে তাকালো সিংহের ছেলে। কিন্তু হাজার হলেও সে চিতা। দিনের বেলা দেখা এক কথা, আর রাতে তারার আলোয়...

'দেখেছো?' আবার বললো কেপু।

কিছু একটা নড়ছে। ঝালির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো, একটা হরিণ। তার পিছু পিছু বেরোলো আরেকটা, তারপর আরেকটা। ঘাসের জমিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একদল গ্যাজেল হরিণ।

ভয় পেয়েছে বাচ্চাটা, কিন্তু বোনকে বুঝতে দিচ্ছে না। তার একটাই ভরসা, কেপু আছে সঙ্গে। যে কোনো রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তাকে, অন্তত চেষ্টা করবেই।

'এবার দেখেছো?' আবার জিজ্ঞেস করলো কেপু।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো বাচ্চাটা।

'ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ছুটতে পারবে না!' চিন্তিত কেপু।

শিকারের সব চেয়ে ভালো সময় এটাই। পুবের আকাশ সবে ধূসর হতে শুরু করেছে। সূর্য উঠতে এখনো অনেক দেরি, কিন্তু মরুর বালিতে আলোর প্রতিফলন শুরু হয়ে গেছে ইতি-মধ্যেই। ধূসর ছিলো, এখন শাদা দেখাচ্ছে বালির পাহাড়টা।

ঘাস-জমিতে পৌঁছে গেছে হরিণগুলো। মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে শুরু করে দিয়েছে।

'এখানে দাঁড়াও,' ভাইকে বললো কেপু। পরক্ষণেই ছুট লাগালো।

তীরের মতো ছুটে ঘাস-জমিতে পৌঁছে গেল ও। লাফিয়ে পড়লো পছন্দসই শিকারের ঘাড়ে। ভয়ানক থাবার এক আঘাতে মাথা গুঁড়িয়ে দিলো। হরিণটাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

বাচ্চাটাকে ডাকতে হলো না। ছুটে চলে এলো। হরিণ-টাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো কেপু। খেতে শুরু করলো ওরা।

ভরপেট খাওয়ার পর কাছে যে ঝোপ পাবে, তার ভেতরেই শুয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়া স্বভাব চিতাবাঘের। কিন্তু কেপুর সে স্বভাব নেই, চিতাদের সঙ্গে থেকে থেকে ওদেরই মতো হয়ে গেছে। গুহায় ফিরে তবে ঘুমাবে।

ভাইকে নিয়ে গুহায় রওনা হলো কেপু। গতি ধীর। হেলে-দুলে হাঁটছে।

অন্ধকার কেটে গেছে পুরোপুরি। পাহাড়ের ওপাশে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে সূর্য। সব ধরনের হরিণ জেগে উঠেছে ঘুম থেকে, রওনা হয়েছে চারণভূমির দিকে। হয়তো বড় বেশি কাছাকাছি হয়ে পড়েছিলো, একে অন্যকে সহ্য করতে পারেনি, তাই মারামারি বাঁধিয়েছে দুটো মদ্দা অরিক্স। ঘরে ফিরে যাচ্ছে নিশাচর জীবেরা। পাথরের আড়াল থেকে বেরোলো একটা শেয়াল। চিতাবাঘ দেখেই হুক্কা-হুয়া ডাক ছেড়ে আবার লুকিয়ে পড়লো। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পাহাড়ের গুহার দিকে এগিয়ে চলেছে দুটো মরুশেয়াল। সারা রাত জেগে শিকার করেছে, এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমাবে।

'ভাই, শুনতে পাচ্ছো?' বললো কেপু।

ঘুম ঘুম চোখে বোনের দিকে তাকালো বাচ্চাটা। শুনতে পায়নি।

আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে ভাইকে ক্যাকটাস বনের দিকে ফেরালো কেপু। দেখা যাচ্ছে এখন জীবটাকে। একটা লাল খরগোশ। ক্যাকটাসের গোড়ায় বসে ঘাস চিবোচ্ছে।

'ধর ওকে! দেখি, কেমন শিকার করতে শিখেছো,' বললো কেপু।

ঘুম দূর হয়ে গেল বাচ্চাটার চোখ থেকে। ছুটলো সে।

দল বেঁধে শিকার ধরতে অভ্যস্থ চিতারা। কয়েকজন মিলে

একসঙ্গে শিকার করে। জায়গায় জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে কয়েকটা চিতা। আর কয়েকটা গিয়ে শিকারকে তাড়া করে নিয়ে আসে যারা ঘাপটি মেরে বসে আছে তাদের দিকে। সিহোর বাচ্চাও তাই করলো। একপাশ থেকে ঘুরে গিয়ে হঠাৎ তাড়া করলো খরগোশটাকে। বাচ্চাটার দিকেই চোখ খরগোশের। টেরই পেলো না, অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুদূত। সোজা এসে কেপুর থপ্পরে পড়লো ওটা।

এক থাবায় বেচারা খরগোশের দফারফা করে দিলো কেপু। নখ দিয়ে চিরে ফেললো গলা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো তাজা গরম রক্ত।

'নাও, জলদি খেয়ে ফেলো,' ভাইকে বললো কেপু।

ঝাঁপিয়ে পড়লো বাচ্চাটা। চেটে চেটে খেতে লাগলো রক্ত!

'দেখেছো...না না ওদিকে নয়, পুবে! দেখেছো ওদের?'

'হ্যাঁ, এবার দেখেছি।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুই ঘোড়সওয়ার। পেছনে বালির পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দলের আর সবাই।

'শিকারে বেরিয়েছে চিতারা··· অনেক দূরে দুটো ছোট্ট বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বললো একজন।

'লিন্‌ক্সের চোখ আপনার, মালিক।'

'তোমার চোখ কম কিসে, তাইতক,' সঙ্গীর দিকে চেয়ে

বললো তরুণ ঘোড়সওয়ার, 'তুমিও তো দেখতে পাচ্ছো।'

সর্দারের ছেলে আমাস্তান। যাযাবর তুয়ারেগ উপজাতি, কয়েকটা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। প্রতিটি গোত্রের একজন করে সর্দার। আমাস্তানের বাবা বিশাল এক গোত্রের সর্দার। আবলুসা থেকে শুরু হয়েছে তার রাজ্য। আসকেরাম পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে ঠেকেছে তাজেরো মালভূমিতে, যেখানে প্রবাহিত হয় দমকা হাওয়া ইরিফি।

বৃদ্ধ হয়েছে সর্দার তাবুকা আগ আমাস্তান, খুব বেশি দিন আর নেই। তার মৃত্যুর পর সর্দার হবে আমাস্তান। মাত্র পনেরো বছর বয়েস, কিন্তু গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছে, দেখলে মনে হয় পঁচিশ বছরের তুয়ারেগ যুবক। তাগড়া জোয়ান, পেটানো স্বাস্থ্য। দুর্ধর্ষ শিকারি।

'আমাদের ঘোড়াগুলো খুব ভালো,' বললো আমাস্তান।

'কেন? শিকার করার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?'

'হচ্ছে।'

'আমারও,' বললো দক্ষ শিকারি তাইতক।

'জাল এনেছে ওরা?' পেছনের সঙ্গীদের দেখিয়ে বললো আমাস্তান।

'আমার কাছেই আছে,' জিনে আটকানো থলেতে চাপড় দিলো তাইতক। 'এর ভেতরে।'

'তাহলে চলো, যাই। কিন্তু সাবধান, জ্যান্ত ধরতে হবে।'

ইঙ্গিত পেয়েই লাফিয়ে উঠলো শিক্ষিত ঘোড়া। তীরের

মতো ছুটে চললো মরুর হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পুবের আকাশে তখন উঠে পড়েছে সূর্য।

বাতাস শিকারিদের প্রতিকূলে। হুহু হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে এলো ঘোড়া আর মানুষের গায়ের গন্ধ। চঞ্চল, সতর্ক করে তুললো কেপু আর তার ভাইকে। গুহা এখনো অনেক দূরে। গন্ধটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে ফিরলো কেপু। চাপা গলায় গর্জে উঠলো। চোখে লাগছে রোদ। ভালোমতো চাইতে পারছে না। আবছা মতো ওদেরকে চোখে পড়লো তার।

'জলদি!' ভাইকে বললো কেপু।

তীর গতিতে ছুটে আসছে ঘোড়া। ওগুলোর অনেক আগে থাকতে হবে, নইলে ধরে ফেলবে শিগগিরই। ঘোড়ার মতো একনাগাড়ে ছুটতে পারবে না কেপু কিংবা তার ভাই। ছোটার অভ্যেস এতো নেই ওদের।

ছুটলো ওরা, ঘোড়ার অনেক আগেই রইলো। সহজেই পালিয়ে যেতে পারে কেপু, কিন্তু পারছে না ভাইয়ের জন্যে। ছোট্ট চিতা ছুটতে পারছে না তেমন। ভরপেট খেয়েছে, তার ওপর ক্লান্ত। বার বার পিছিয়ে পড়ছে। তার জন্যে থামতে হচ্ছে কেপুকে।

'জলদি, জলদি করো!' তাড়া লাগালো কেপু।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ছোট্ট চিতা, দম নিয়ে সারতে পারছে না। পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ভাইয়ের শ্বাস ফেলার

শব্দ শুনতে পাচ্ছে কেপু। পেছন থেকে কানে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। কাছে এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

'জলদি, আরো জলদি!' বললো বটে, কিন্তু কেপু বুঝলো, জোরে ছুটতে পারবে না তার ভাই। আর এগোতে পারবে কিনা সেটাই সন্দেহ।

এই সময়ই ফন্দিটা মনে এলো কেপুর। চোখা পাথরের মরুতে ঢুকে পড়লে কেমন হয়? তাদের পায়ের চিহ্ন পড়বে না পাথরে। লুকিয়ে পড়লে খুঁজে বের করতে পারবে না মানুষেরা। আশার কথা, শিকারিদের সঙ্গে কুকুর দেখা যাচ্ছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আশা নিরাশায় পরিণত হলো। সালুকি কুকুরের ঘণ্টার মতো ভারি গলা কানে এলো। সামনের দুই শিকারির সঙ্গে নেই, কিন্তু পেছনে আছে ওগুলো। ঘোড়ার চাপা গোঙানিও কানে আসছে।

পাথুরে মরুতে ঢুকে পড়াই স্থির করলো কেপু। যেভাবেই হোক, লুকিয়ে পড়তে হবে। নইলে রক্ষা নেই।

মোড় ঘুরলো কেপু। তিন লাফে উঠে গেল পাথুরে মরুতে। হাঁপাতে হাঁপাতে পিছু নিলো তার ভাই। ছুটে পেরিয়ে এলো ওরা একটা ছোটো টিলা।

'আরো...আরো জোরে..' ভাইকে বললো কেপু।

যেখান থেকে ওরা মোড় নিয়েছে, ওখানে ঘোড়সওয়ারেরা পৌঁছে যাবার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরে পড়তে হবে,

লুকিয়ে পড়তে হবে। টিলাটা মানুষদের চোখের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বুঝে যাবে ওরা ঠিকই, কোনদিকে মোড় নিয়েছে কেপু আর তার ভাই।

পাহাড়টা চোখে পড়লো কেপুর। আর বেশি দূরে নেই। কোনোমতে গুহায় গিয়ে ঢুকতে পারলে···কিন্তু সমস্যা কুকুর-গুলোকে নিয়ে। ওরাও ঢুকে পড়তে পারে

কুকুরের চিৎকার থেমে গেছে। ঘোড়ার শব্দও কানে আসছে না। আরেকটু এগোতে পারলেই রক্ষা পেয়ে যাবে এযাত্রা। ঠিক এই সময় ঘটলো অঘটন। চোখা পাথরে লেগে এক পায়ের নিচের নরম মাংস কেটে গেল বাচ্চাটার। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ছুটতে পারলো না আর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললো কোনো-মতে। বাধ্য হয়েই কেপুর তীব্র গতি কমাতে হলো। মাল-ভূমিতে পৌঁছুতে দেরি করে ফেললো অনেক। নিশ্চয় পেছনে এসে পড়েছে মানুষ। মালভূমি পেরোতে গেলেই এখন ওদের চোখে পড়ে যাবে।

পেছনে ফিরে চাইলো কেপু। হ্যাঁ, এসে পড়েছে শিকা-রিরা। টিলাটা পেরিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে ঘোড়া। ধরে ফেললো বলে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হঠাৎ বাচ্চাটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো কোনোমতে। কয়েক পা এগিয়েই আবার পড়ে গেল। ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো কেপু।

এসে গেছে ঘোড়সওয়ারেরা। ওদের দিকে চেয়ে আকাশ

কাঁপানো গর্জন করে উঠলো কেপু। ভয়ানক গর্জনে চমকে গেল ঘোড়া আর মানুষ। থমকে গেল খানিকের জন্যে। কিন্তু এই প্রথম নয়, জাল দিয়ে এর আগেও অনেক বার চিতা ধরেছে ওরা। জোরে ছোটার জন্যে ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো লাগালো শিকারিরা।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বাচ্চাটা। তার ঘাড়ের চামড়া কামড়ে ধরলো কেপু। অবলীলায় ভারি দেহটাকে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে। তবে গতি কমে গেল। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো দ্রুত। তবু হাল ছাড়লো না কেপু। এগিয়ে চললো...আর মাত্র কয়েক পা...ওই তো, ক্যাকটাসের সারি...ওখানে পৌঁছে যেতে পারলেই ··

কিন্তু পারলো না। তার আগেই এসে পড়লো শিকারিরা। ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে এলো ঘোড়া। জোর গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে কেপুকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে কুকুরগুলো।

কেপুর গর্জন, কুকুরের চিৎকার গুহায় বসেই শুনতে পেয়েছে সিহো আর বাবা চিতা। ছুটে বেরিয়ে এসেছে গুহার বাইরে। ঝোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে সব...দেখতে পাচ্ছে, তাদের ছেলেকে মুখে নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে কেপু...না, উঠতে পারলো না, তার আগেই গায়ের ওপর উঠে পড়লো একটা ঘোড়া...ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তেও কোনো-মতে সামলে নিলো কেপু···ছুটে চলে গেল ক্যাকটাসগুলোর ভেতরে, মুখ থেকে নামিয়ে দিলো ভাইকে ...

'পালাও .. জলদি পালাও... সোজা গুহায় চলে যাও!' আদেশ দিলো কেপু।

কেপুর মুখে ঝুলে থেকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম পেয়েছে ছোট্ট চিতা। ছুটলো। ধূসর পাথরে ঢাকা ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলো প্রাণপণে। প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছে, পা পিছলালো এই সময়। পাথর আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকালো কোনোমতে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে সাহস জোগালো সিহো। সাহায্য করতে ছুটে এলো বাবা চিতা।

খুব দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাগুলো।

ক্ষণিকের জন্যে বাবা-মাকে দেখলো একবার কেপু। তারপর ফিরলো। শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে শিকারিদের। ভয়ানক গর্জন করে উঠলো কেপু। বেরিয়ে পড়লো ভীষণ দাঁত।

'খবরদার, তাইতক! চেঁচিয়ে উঠলো আমাস্তান। ও-ই প্রথম বুঝতে পেরেছে, যাকে ধরতে এসেছে ওরা, ও চিতা নয়।

'খবরদার!' আবার হুঁশিয়ার করলো আমাস্তান। 'বেশি কাছে যেও না, তাইতক। ওটা চিতাবাঘ!'

'আগে কুকুরগুলো যাক।' চেঁচিয়ে বললো তাইতক। 'তার আগে যাবেন না!...যাবেন না।' ঘোড়া পিছিয়ে আনলো সে। কুকুরগুলোকে আগে বাড়ার আদেশ দিলো।

তিন দিক থেকে কেপুকে ঘিরে ফেললো ঘোরসওয়াররা। বেশি কাছে এগোলো না। কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিলো। ওরা আগে যাক, তারপর দরকার পড়লে যাবে মানুষেরা।

কেপুকে ঘিরে ফেললো কুকুরের দল। ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। হঠাৎ সব চেয়ে সাহসী কুকুরটা এগিয়ে এলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো কেপুর ওপর। মাত্র এক মুহূর্ত। শাঁই করে থাবা চালালো কেপু। মারাত্মক ধারালো নখ চিরে দিলো কুকুরের বুক-পেট। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠে লুটিয়ে পড়লো কুকুরটা।

রক্তের গন্ধ এসে নাকে লাগলো কেপুর। ভেতরের ভয়ংকর দানবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো নিমেষে। সামান্য একটু ভয় যা-ও ছিলো মনে, দূর হয়ে গেল। সবুজ চোখের প্রান্তে লালচে আভা, ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে যেন মণিদুটো।

এগিয়ে এলো আরো দুটো কুকুর, এবং প্রায় একই সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো। থাবা মেরে ওদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে কেপু।

বর্শা তুললো এক শিকারী।

'না না, ছুঁড়ো না!' চেঁচিয়ে নিরস্ত করলো ওকে আমাস্তান। 'জ্যান্ত ধরতে হবে!'

গোলমালের মাঝে চিতার বাচ্চাটার কথা ভুলে গেল ওরা। এই সুযোগে তাকে নিয়ে ঝোলা বারান্দায় ফিরে গেল বাবা চিতা, নিরাপদে। ছেলেকে গুহার ভেতর পাঠিয়ে দিলো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিহো। অবাক হয়ে দেখলো, কি করে চোখের পলকে তিনটে বিশাল কুকুরকে ধরাশায়ী করলো তার পালিতা-মেয়ে। এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলো সে,

বুকের দুধ খাইয়ে পালুক আর যাই করুক, কেপু চিতাবাঘের বাচ্চা। তাকে চিরদিন ধরে রাখার সাধ্য সিহোর নেই।

'কেপুকে মেরে ফেলবে ওরা...' চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠলো সিহো।

কোনো জবাব দিলো না বাবা চিতা। নীরবে চেয়ে আছে নিচের দিকে।

কুকুরগুলো ঘিরে আছে কেপুকে। এগোতে সাহস করছে না আর। ঘোড়া ছুটিয়ে এলো তাইতক। হাতে জাল। কুকুরের বুহের ভেতরে চলে এলো। হাতের বর্শাটা মাটিতে গেঁথেই জাল ছুঁড়ে মারলো কেপুকে লক্ষ্য করে।

শাঁ করে সরে গেল কেপু। জাল পড়লো না তার ওপর। গর্জে উঠলো চাপা গলায়।

আবার জাল ছুঁড়লো তাইতক। সরে গেল কেপু। আবার জাল উড়ে এলো। আবার সরে গেল।

কিছুতেই কেপুকে জালে আটকাতে পারছে না তাইতক।

ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো আমাস্তান। চেঁচিয়ে বললো, 'দেখি, আমি চেষ্টা করে।'

'তুমি...জখম-টখম...'

'জালটা দাও।' হাত বাড়ালো আমাস্তান।

পাশাপাশি রইলো দুটো ঘোড়া। সরতে হলে একই সঙ্গে সরছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। দুটো ঘোড়া একই সঙ্গে এগোলো কেপুর দিকে। কুকুরগুলো ঘিরে আছে চারদিক

থেকে। চেঁচাচ্ছে একনাগাড়ে। জালটা ভাঁজ করে সঙ্গীর হাতে তুলে দিলো তাইতক।

'সাবধানে, আমাস্তান!'

'সরো, সরে যাও!'

'খুব সাবধান!'

'সরো...আরো সরো...'

আদেশ অমান্য করলো তাইতক। হঠাৎ তুলে নিলো বর্শা। সামান্য সরে গিয়েছিলো, ঘোড়াটাকে আবার নিয়ে এলো আমাস্তানের ঘোড়ার পাশে।

'রাইনা!' চেঁচিয়ে উঠলো আমাস্তান।

লাফিয়ে কেপুর কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়া। পরক্ষণেই সরে যাবার চেষ্টা করলো। শক্ত হাতে লাগাম ধরে রেখেছে আমাস্তান, টানাটানি করছে। কিন্তু স্থির রাখতে পারছে না। কেবলই পিছিয়ে যেতে চাইছে ঘোড়াটা।

'রাইনা!'

ঝাড়া দিয়ে লাগাম ছেঁড়ার চেষ্টা করলো রাইনা। চেঁচিয়ে উঠলো আতংকে। চামড়ার ফিতের ঘষায় নাক ছিলে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। এগোলো এক পা। ধারালো নখ বসে গেল তার এক পাশের মাংসে। গভীর হয়ে চিরে গেল দু'জায়গায়। রক্ত ছুটলো। বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠে আঘাত হেনেছে কেপু।

গায়ের ওপর উঠে এলো ঘোড়া। খুরের নিচে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলো কেপু। কান ফাটানো গর্জন করে উঠলো।

চমকে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। এই সুযোগে নিচ থেকে বেরিয়ে এলো সে। মাত্র দুই কদম দূরে মাটিতে পড়ে আছে ঘোড়সওয়ার। এগিয়ে গিয়ে থাবা চালালেই হলো।

ছাড়া পেয়েই ঘুরে দাঁড়ালো রাইনা। সরে এলো তিন লাফে। ঝেড়ে দিলো দৌড়। যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমানায় আর থাকতে চায় না সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আমাস্তান। তাকে আর কেপুকে ঘিরে ফেলেছে ঘোড়সওয়াররা। বর্শা বাগিয়ে ধরেছে। ছুঁড়ে মারবে। চোখের পলকে জানোয়ারটাকে গেঁথে ফেলবে মাটির সঙ্গে।

'না না, মেরো না!' চেঁচিয়ে উঠলো আমাস্তান। কেপুর দিকে চেয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেল।

শাঁই করে বাতাস কাটলো কেপুর থাবা। কোনো কিছুতে বাধলো না।

একই সঙ্গে ঘটলো কয়েকটা ঘটনা। লাফ দিলো কেপু। এক থাবায় মাথা গুঁড়ো করে দিতে চায় শিকারির। জাল ছড়িয়ে ফেললো আমাস্তান। বর্শা ছুঁড়ে মারলো তাইতক।

কেপু শূন্যে থাকতেই জাল পড়লো মাথার ওপর। থাবা আটকে গেল। মাটিতে পড়তে না পড়তেই কাঁধে এসে গেঁথে গেল বর্শা। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। বর্শাটা খোলার চেষ্টা চালালো। পারলো না। নড়াচড়ায় জড়িয়ে গেল জালে। প্রচণ্ড রাগে গর্জন করে উঠলো। কিন্তু কিছুই আর করার নেই।

অসহায় করে দিয়েছে তাকে শিকারিরা।

'বাপরে বাপ!' গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো আমাস্তান। 'কি লড়াটাই না লড়লো! জানোয়ার বটে একখান!'

টপাটপ লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো সবাই। ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলো কুকুরগুলোকে।

'মরুভূমির জীব না ওটা,' বললো তাইতক। 'রঙ দেখছো? আগুনের মতো জ্বলছে!'

'হ্যাঁ, খুব উজ্জ্বল!'

'মরুভূমির চিতাবাঘের কোমর আরো সরু হয়, চিতার মতো।'

'ঠিক। রঙও অনেক ফ্যাকাসে।'

'ওটাকে কি করবেন? জিজ্ঞেস করলো তাইতক। 'চিতার দলের সঙ্গে রাখতে পারবেন না ওই ভয়ানক জীবকে। ঘোড়ার পেছনে তুলে নিয়ে শিকারেও যেতে পারবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো না আমাস্তান। চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে রইলো কেপুর দিকে। তার সবুজ জ্বলন্ত চোখের দিকে। বিড়বিড় করলো, 'কেন পারবো না!'

ঘোড়ার লাগাম ধরে কেপুকে ঘিরে ফেলেছে শিকারিরা। ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ গর্জে উঠলো কেপু।

'আমার চাবুক!' আদেশ দিলো আমাস্তান।

ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চাবুক খুলতে লাগলো এক

ঘোড়সওয়ার। আমাস্তানের ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে এনেছে সে।'

'কি করবেন?' জানতে চাইলো তাইতক।

'মুখে আটকে দেবো,' বললো আমাস্তান, 'যাতে কামড়াতে না পারে।'

'চাবুক আটকাবেন?'

'হ্যাঁ। তোমরা সবাই এসো, হাত লাগাও। খবরদার, আর মারধর করো না ওকে। ও কুকুর নয়, আজেবাজে প্রাণী নয়। দাও, চাবুকটা দাও।'

'আমাদের কি করতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো একজন।

'একটা ছুরি দাও,' চাবুকটা নিতে নিতে বললো আমাস্তান। 'তাইতক, মুখের কাছের জাল কাটো, খুব সামান্য। খবরদার, দাঁতের কাছে হাত নিও না। তোমরা, দড়ি বের করো। শক্ত দড়ি।'

'এই যে দড়ি,' বললো একজন।

'বর্শার ডাণ্ডা দিয়ে চেপে ধরো ওকে। নড়তে যেন না পারে।'

বেটে হাতলে পুরো চাবুকটাকে পেঁচালো আমাস্তান। এগিয়ে গেল কেপুর দিকে। বর্শা দিয়ে চিতাবাঘটাকে চেপে ধরেছে সবাই। চাপা গলায় গর্জন করছে কেপু। সাবধানে তার মুখের কাছের জাল কয়েক ইঞ্চি চিরে ফেললো তাইতক।

হাতলের একটা মাথা কেপুর হাঁ করা মুখে ঢুকিয়ে দিলো আমাস্তান। কপ করে কামড়ে ধরলো কেপু। টান দিয়ে ছাড়িয়ে

নেবার চেষ্টা করছে আমাস্তানের হাত থেকে।

'তাইতক,' চেঁচিয়ে বললো আমাস্তান। 'দড়ির ফাঁস আটকে দাও ওর নাকে-চিবুকে। জলদি!'

কয়েকবার চেষ্টা করলো তাইতক, পারলো না।

'দাও, আমার হাতে দাও,' হাত বাড়ালো আমাস্তান। হাতলটা আবার বাড়িয়ে ধরলো কেপুর দিকে। কেপু আবার কামড়ে ধরতেই হাত ছেড়ে দিলো সে। চট করে ফাঁসটা গলিয়ে দিলো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আটকে ফেললো কেপুর নাকে-চিবুকে।

হাত লাগালো তাইতক। দ্রুত হাতে পেঁচিয়ে ফেললো দড়িটা। মুখ আটকে গেল কেপুর। কামড়াতে পারবে না এখন।

অতি সাবধানে জাল কেটে কেপুর পা একটা একটা করে বের করে আনা হলো। বেঁধে ফেলা হলো সঙ্গে সঙ্গে। নড়ার উপায় রইলো না আর তার।

'চমৎকার!' আস্তে আস্তে কেপুর গায়ে চাপড় দিলো আমাস্তান।

গোঁ গোঁ করে উঠলো কেপু।

'খামোকা রাগ করছো,' মোলায়েম গলায় বললো আমাস্তান।

অপরিচিত গলা, কিন্তু স্বরের কোমলতা ঠিকই বুঝতে পারলো কেপু।

'জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে কে শিখিয়েছে আপনাকে!' বললো তাইতক।

'কেউ না।'

'দেখে মনে হচ্ছে, কথা বুঝতে পারছে বাঘটা।

'কথা বুঝবে, শুনবেও। কিছুদিন অপেক্ষা করো, তারপর দেখো।'

'শুনবে...'

'বর্শাটা খুলে ফেলা দরকার। ব্যথা পাচ্ছে।' বর্শার হাতল চেপে ধরলো আমাস্তান। আবার গোঁ গোঁ করে উঠলো কেপু। ছাড়া পাবার চেষ্টা করলো। 'নড়ো না, মেয়ে, চুপ করে থাকো। বেশি ব্যথা পাবে না।' হ্যাঁচকা টান দিয়ে বর্শাটা খুলে আনলো আমাস্তান। আবার গুঙিয়ে উঠলো কেপু। 'ব্যস, হয়ে গেছে। এবার বুড়ো আবদুল মলম লাগিয়ে দেবে তোমার কাটায়। শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে। তাইতক?'

'বলুন।'

'মলম লাগানো শেষ হলে তোমার ঘোড়ায় তুলে নাও। ভালো করে বাঁধবে। দেখো, যেন পড়ে-টড়ে না যায়।'

দিগন্তে মিলিয়ে গেল ধুলোর মেঘ। চুপচাপ সেদিকে চেয়ে আছে সিহো আর বাবা চিতা। নীরব। কোথায় কতদূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের মেয়েকে, জানে না। ওরা জন্ম দেয়নি কেপুকে, পেলেছে শুধু। তবে ভালোবেসেছে আপন মেয়ের মতোই।

'সিহো।'

জবাব দিতে পারলো না মা। গলায় কিসের দলা আটকে গেছে যেন।

'সিহো, ওরা কেপুকে মারবে না।'

'না,' কান্নারুদ্ধ মায়ের গলা।

'ওভাবেই জাল দিয়ে চিতা ধরে নিয়ে যায় ওরা।'

'জানি। কিন্তু কুত্তার মতো গলায় লোহার শিকল বেঁধে ঘোরাবে ওরা কেপুকে, বাঁদী বানিয়ে রাখবে।'

'ওভাবে বলো না, সিহো।'

'চলো...গুহায় ফিরে যাই!'

দিন গেল, রাত গেল, ঘুমালো না দুই চিতা। পরদিন ভোরে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলো ওরা। শিকার শেষ করে এখুনি যেন ফিরে আসবে মেয়ে, সেই অপেক্ষাই যেন করছে।

আলো ফুটলো, রোদ উঠলো। দিগন্তের ওপরে আকাশে হঠাৎ কালো একটা বিন্দু দেখা দিলো। বড় হতে লাগলো ধীরে ধীরে। মাথার ওপর চলে এলো ওরা। পাখির ঝাঁক।

তাকিয়ে আছে সিহো আর বাবা চিতা।

ওদের মাথার ওপর একবার চক্কর দিলো পাখিগুলো। কেপুর লাল পাখি। ডেকে উঠলো বিষণ্ণ গলায়। তারপর উড়ে চলে গেল উল্টো দিকে। ক্রি নদীর ধারে, সাভান্নার ওপারে, বাউ জঙ্গলে ফিরে চলেছে ওরা। কেপুর সঙ্গে খেলা শেষ, বুঝে গেছে পাখিগুলোও।

এগারো

শেষ-বিকেলের গান

অপূর্ব সুন্দর এক বিকেল।

বেদুইনদের তাঁবুর চারপাশে দড়িতে বাঁধা ঘোড়াগুলো শান্ত। কোনোটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা খাচ্ছে। নহর থেকে পানি নিয়ে ফিরছে মেয়েরা। তাদের কাঁধে মাটির পাত্র, হাঁটার তালে তালে পানি ঝলকে পড়ছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে এলো একদল ঘোড়সওয়ার। বেদুইন পাহারাদার। আবালুসা থেকে রিও পর্যন্ত চলে গেছে লম্বা পথ। ওই পথ ধরে রিওর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো ওরা, এখন তাঁবুতে ফিরেছে। মাঝেমধ্যেই দল বেঁধে আসে খুনে রেজুরা, উট চুরি করে নিয়ে যায়। এই কদিন আগেও এসেছিলো। ওদের চিহ্ন ধরে ধরেই গিয়েছিলো পাহারাদাররা। কয়েকটা চোরকে ধরে আচ্ছামতো পিটুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। শাসিয়ে এসেছে, এরপর ধরা পড়লে সোজা জবাই করে ফেলবে। দিন কয়েক অন্তত আর আসবে না ওরা, আজ রাতে তো নয়ই।

সর্দারের তাঁবুতে এসে ঢুকলো ওরা। জানালো সব কথা। আসকেরাম পর্বতমালার দক্ষিণে পালিয়েছে রেজুরা, আসবে না এদিকে আর। শুনে গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালো সর্দার।

অসংখ্য তাঁবু। মাঝের বড় তাঁবুটা সর্দারের। ভেতরে বালিতে বিছানো উলের পুরু গালিচা। গালিচার ওপরে বিছানো একটা চিতাবাঘের চামড়ার ওপরে বসেছে সর্দার, তাকে ঘিরে বসেছে তার আমলা আর পাহারাদাররা। বাইরে সূর্য ডুবে গেছে। আঁধার নামতে দেরি নেই। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

সবাই চা খাচ্ছে, সঙ্গে হাতে বানানো চুরুট।

শান্ত পরিবেশ। এটা গান শোনার বিকেল, ভালোবাসার বিকেল।

তাঁবুতে এসে ঢুকলো একদল সুন্দরী মেয়ে, পুরো গোত্রে সব চেয়ে সুন্দরী তারা। মরুর ঝিরঝিরে বাতাস আর নহরের কুলকুল ধ্বনির মতোই মিষ্টি তাদের গলা। কথা তো নয়, যেন চুড়ির রিনিঝিনি। সুন্দর সাজে সেজে এসেছে ওরা। মুগ্ধ চোখে তাকালো পুরুষেরা।

তাঁবুতে এসে ঢুকলো সর্দারের ছেলে আমাস্তান। বাবার পাশে এসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলো। তাকালো মেয়েদের দিকে। এবার গান শুরু করা যায়।

আমাস্তানের সুন্দর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েরা। এগিয়ে এসে সামনে বসলো তিলিয়ানা, সর্দারের মেয়ে, আমাস্তানের বোন। হাতে আমজাদ,—বেদুইনদের প্রিয়

ছোট্ট বেহালা। মরুর রাতের মতোই কালো তার চুল, উজ্জ্বল সোনালি-সবুজ চোখ। দু'কানে দুলছে নতুন চাঁদের মতো দেখতে দুটো দুল, ঝিকিয়ে উঠছে প্রদীপের আলোয়।

বেজে উঠলো বেহালা, গান ধরলো তিলিয়ানা। মহান নোমাদ উপজাতির প্রিয় গান, বিস্তীর্ণ তৃণভূমির গান, মরুর গান। ছড়িয়ে পড়লো সুরের মূর্ছনা। গানের কথাগুলো বড় মিষ্টি, ভারি ছন্দময় :

মরুর দামাল হাওয়া,
কোথায় তোমার ঘর ?
হরিণের চেয়ে দ্রুত তোমার গতি,
গ্যাজেলের চেয়ে হালকা,
ছুটে যাও ঘাসের ওপর দিয়ে, বালির ওপর দিয়ে,
দূরে জিন-পাহাড়ের দিকে,
তারপর ? কোথায় যাও তুমি ?
কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ?

গান থামলো। অভিভূত শ্রোতাদের দিকে তাকালো একবার তিলিয়ানা। ভাইয়ের দিকে চেয়ে হাসলো। কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সালাম জানালো ভাবী সর্দারকে। পিছিয়ে বসলো।

এগিয়ে এলো সুন্দরী দাসিন। আমজাদ বাজিয়ে গাইলো। তারপর গাইলো তিনা-গালুজ। অপূর্ব গলা। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেল থেইয়া। ওর গলার তুলনা হয় না। মরুর দমকা

হাওয়ার মতোই সুরের মূর্ছনা ছুটে গেল দিকে দিকে, দামাল হাওয়ায় ভর করে বোধহয় জিনের পাহাড়ের ওদিকে চলে গেল... কাঁপন তুললো যেন ঘাসের বুকে...

তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে আমাস্তান। পায়ের কাছে বসে আছে তার দুটো পোষা চিতা। চুপচাপ। চোখ আধবোজা করে তাকিয়ে আছে গায়িকার দিকে।

গাইছে থেইয়া :

সেই যে কবে যুদ্ধে গেল সে।
আজো না এলো ফিরে,
পথ চেয়ে তার কাটে আমার দিন,
কাটে দীর্ঘ রাত,
আকাশে জ্বলে তারা, জাগে হলুদ চাঁদ,
কান পেতে রই আমি,
কিন্তু কই। মরুর বুকে বাজে না-তো দামাল ঘোড়ার খুর।
আর কি কোনোদিন,
আসবে ফিরে যুদ্ধ থেকে সে?

বাইরে গভীর রাত। সময় কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেল, হুঁশ নেই কারো। করুণ সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন হাহাকার বিলাপে তাঁবুর গায়ে এসে আছড়ে পড়েছে হাওয়া। ফুরিয়ে এলো প্রদীপের তেল। নিভু নিভু হয়ে এসেছে। সভা ভাঙার আদেশ দিলো সর্দার।

উঠলো আমাস্তান। বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। তারাজ্বলা

আকাশের দিকে চাইলো একবার। বুক ভরে টেনে নিলো রাতের হাওয়া। নিজের তাঁবুতে এসে ঢুকলো। চিতা দুটো এলো তার সঙ্গে সঙ্গে।

তাঁবুর একপাশে গালিচার ওপর বিছানো মোটা কম্বল, আমাস্তানের বিছানা। পাশেই একটা সিংহের চামড়ার ওপর শুয়ে আছে কেপু। গলায় লোহার শেকল। মাটিতে গাঁথা খুঁটির সঙ্গে আটকানো। প্রভুকে দেখেই চোখ মেললো কেপু, মুখ তুললো। চিতাদুটো এগিয়ে গিয়ে তার মুখে মুখ ঘষে দিলো।

থেইয়া আর তার গানের কথা ভাবতে ভাবতে এগোলো আমাস্তান। হাসলো। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে চাপড়ে দিলো কেপুর মাথা।

'তারপর, কেমন আছো, মেয়ে?' হাসিমুখে বললো আমাস্তান। 'এখনো জানোই না, তুমি চিতা, না চিতাবাঘের বাচ্চা!'

গর্জে উঠলো কেপু, কিছুই করলো না। ওই আলতো চাপড় এখন তার পরিচিত। জানে ওতে আশংকার কিছু নেই। তবে শুধু আমাস্তান, আর কাউকে গায়ে হাত দিতে দেয় না সে। ওই মানুষটা তাকে উটের দুধ খেতে দেয়, কাঠের রেকাবিতে মাংস কেটে দেয়।

সেই যে সেদিন, কেপুকে ধরে এনে লোহার শিকলে বেঁধেছে মানুষটা। তার হাতে কামড়ে দেবার চেষ্টা করেছে কেপু। লোকটা ভয় পায়নি। তার ক্ষতে কি যেন লাগিয়ে দিলো।

খুব আরাম পেয়েছে কেপু। মানুষটার মোলায়েম নিচু গলা ভালো লাগে তার। লোকটা তার কোনো ক্ষতি করবে না বুঝে গেছে। কামড়ানোর চেষ্টা করে না এখন আর কেপু।

বন্ধুদের ডেকে এনে কেপুকে দেখায় আমাস্তান, গর্ব করে। মাঝে মাঝেই ভাই আর তার পোষা জানোয়ারগুলোকে দেখতে আসে তিলিয়ানা। আলাপ আলোচনা করে। খুব ভাব দুজনে।

এ-রাতেও এলো তিলিয়ানা, আমাস্তান, তাঁবুতে ঢোকার খানিক পরেই।

'তিলিয়ানা, দেখ দেখ, তোর আর ওর চোখের রঙ ঠিক এক!' বোনকে দেখেই বলে উঠলো আমাস্তান।

হাসলো তিলিয়ানা। তার ওই ভাইটা কি কোনোদিন যোদ্ধা হবে? যুদ্ধ করতে যাবে? কেমন যেন ভাবুক, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝেই যেন কেমন এক ধরনের ছায়া পড়ে চোখের তারায়, ঠিক বুঝতে পারে না তিলিয়ানা। যুদ্ধ ভালোবাসে না সে, অহেতুক প্রাণী হত্যা অপছন্দ। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে মরুভূমিতে, সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে তাইতক। অনিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়ায়, জানোয়ার ধরে আনে। তাদের সঙ্গে কথা বলে আপন মনেই, আদর যত্ন করে। ওরাই যেন তার সত্যিকারের বন্ধু।

'ভাইয়া,' হেসে বললো তিলিয়ানা, 'চিতাবাঘটা তার নাম বলেছে তোকে?'

'ঠাট্টা করছিস, তিলিয়ানা?'

'না রে, ভাইয়া। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি। জানোয়ারগুলো তো কথা বলে তোর সঙ্গে!'

'বলবে, তিলিয়ানা, বলবে। চিতার চেয়ে চিতাবাঘেরা বুনো, পোষ মানতে অনেক দেরি করে। কিন্তু দেখিস, ওকে আমি পোষ মানাবোই। ওর নামও জেনে নেবো। অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানিস? এই বাঘটা বড় হয়েছে চিতার ঘরে। যেদিন ওকে ধরে আনলাম, একটা চিতার বাচ্চা ছিলো ওর সঙ্গে। দুটোতে শিকার করছিলো। ওকে আমি খুব ভালোবাসি, তিলিয়ানা, আমার আর সব জানোয়ারের চেয়ে'

'জানি, ভাইয়া।'

'জানিস? কি করে?'

'ওর সঙ্গে তোর স্বভাবের অনেক মিল আছে।'

'যাহ্, ফাজলেমি করছিস...'

'না, ভাইয়া, ঠিকই বলছি। তুই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস, বাঘটাও তাই করে... একেবারে তোর মতো!'

'একেক সময় কি মনে হয় জানিস, তিলিয়ানা? মনে হয়, ও যেন কিছু বলতে চায় আমাকে! কিছু একটা বোঝাতে চায়!'

'আসলে কি জানিস? তুই কথা বলিস ওদের সঙ্গে। তোর ভাষা বোঝে না ওরা, কিন্তু আকার-ইঙ্গিত বোঝে। জবাব দিতে চায়। ওদের ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। বলতে চায়: আমিও তোমাকে ভালোবাসি, আমাস্তান।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি...' বিড়বিড় করলো আমা-

স্তান। কেমন একটা ছায়া পড়লো চোখের তারায়।

'অনেক রাত হয়েছে, ভাইয়া, তুই শুয়ে পড়। ...আমি চলি...'

বোন বুঝতে পারে না ভাইকে, সর্দার বুঝতে পারে না তার ছেলেকে, বুঝতে পারে না পুরো গোত্রের কেউই। আমির তাবুকা, যার নাম শুনলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খায়, যার তলোয়ারের ঝলকানি দেখলে জান উড়ে যায় শত্রুদের, সেই বেদুইন সর্দারের ছেলে এমন হলো কেন। যুদ্ধ ভালোবাসে না বেদুইনের ছেলে, এটা একটা কথা হলো। কিন্তু তাই বলে তার ছেলে ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়, এটাও বোঝে বাবা। মনে মনে একটু সান্ত্বনা পায়। ভাবে, বয়েস বাড়লে, দায়িত্ব কাঁধে চাপলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুদিন আগে হানা দিয়েছিলো যাযাবর ডাকাতের দল। নিজের দল নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো তাবুকা। যুদ্ধে আমাস্তানও যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছে। পরাজিত শত্রুদের ধরেও ছেড়ে দিয়েছে, হত্যা করেনি। বেদুইন সমাজে এটা নিয়মের বরখেলাপ।

কেপুর পাশে বসে পড়লো আমাস্তান। কথা বলতে থাকলো নরম গলায়। রাত বাড়ছে, খেয়ালই নেই। জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে এসেছে সে? কার মেয়ে? কি নামে ডাকতো তাকে তার বাবা-মা?

চুপচাপ শুনছে কেপু। মোলায়েম গলা মানুষটার। নরম

হাতে তার মাথা কাঁধ ডলে দিচ্ছে। অদ্ভুত সব শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, কিছুই বুঝতে পারছে না কেপু।

বোনের চোখের সঙ্গে মিল আছে চিতাবাঘটার চোখের। একই নাম রাখলে কেমন হয়? বিড়বিড় করে বললো সে, 'তিলি-য়ানা...'

চোখ তুলে তাকালো চিতাবাঘটা। চাপা গলায় গররর করে উঠলো। মুখ থেকে বেরোনো আওয়াজটা কেমন অদ্ভুত শোনালো।

থমকে গেল আমাস্তান। হঠাৎ দু'হাতে চিতাবাঘটার চিবুক তুলে ধরলো। তাকালো ওর সোনালি-সবুজ চোখের দিকে। 'পেয়েছি! বলেছিলাম না, একদিন ওর নাম বলবে আমাকে!... বলবেই!...কেপু! বাহ্, কি সুন্দর নাম!'

কেপুর গলার শেকল খুলে দিলো আমাস্তান। 'কেপু, তুমি মুক্ত! যেখানে খুশি যাও!'

উঠলো কেপু। ধীরেসুস্থে হেঁটে গেল তাঁবুর দরজার কাছে। মুখ বের করে দিলো বাইরে। তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকালো, বুক ভরে টেনে নিলো রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া। তার-পর ফিরলো হঠাৎ। আবার ধীরেসুস্থে হেঁটে এসে শুয়ে পড়লো আগের জায়গায়, সিংহের চামড়ার বিছানায়।

'চিতার মতো ওকে দিয়ে কখনো শিকার করাতে পারবেন না,' বললো তাইতক।

'হয়তো,' বললো আমাস্তান। 'কিন্তু আমার সঙ্গে শিকারে যাবে সে। পাশাপাশি থাকবে।'

'তাতে কি লাভ? চিতার মতো শিকারের শিক্ষা দিতে পারবেন না ওকে। ও ওভাবে কথা শুনবে না।'

'ও আমাকে ভালোবেসেছে। আমার পোষা আর কোনো জানোয়ারই এতোখানি ভালোবাসেনি।'

'আপনিও ওকে ভালোবেসেছেন।'

'ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসা দিতেই হবে, তাইতক, এরই নাম বন্ধুত্ব। এসব ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণা নেই।'

'মাঝে মাঝে কেপুকে হিংসেই করি আমি, মালিক।'

'সেটা তোমার ব্যাপার।'

আমাস্তানের তাঁবুতে বসে কথা বলছে দুজনে। চিতাগুলোর দায়িত্ব এখন তাইতকের ওপর। রূপার বাঁশি বাজিয়ে জানোয়ারগুলোকে আদেশ দেয় সে, কথা না শুনলে চাবুক মেরে শায়েস্তা করে। আমাস্তান শুধু কেপুকে নিয়েই থাকে।

'দেখে মনে হয়, তাঁবুটা এখন কেপুর,' হাসলো তাইতক, 'আপনার নয়।'

হাসলো আমাস্তান। ফিরে তাকালো। ভুল বলেনি তাইতক। তার প্রিয় লাল গোল তাকিয়াটা দখল করেছে কেপু। রানীর মতো বসে আছে ওটার ওপর। চেয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

আমাস্তানের তাঁবুর আশেপাশে আর কোনো জানোয়ারই আসে না এখন, কেপুর ভয়ে। হিংসুক কুকুরগুলো পর্যন্ত দূরে

দূরে থাকে। এমন কি তাঁবুর আশপাশে পড়ে থাকা লোভনীয় হাড় চিবোতেও আসে না।

'কেপুকে শিকারে নিয়ে যাবেন কবে?' জিজ্ঞেস্ করলো তাইতক।

'শিগগিরই।'

'রেগ-এ?'

'হ্যাঁ।'

'যেখানে ওকে ধরেছেন?'

মাথা ঝোঁকালো আমাস্তান। 'একটা পরীক্ষা চালাতে চাই।'

'আপনাকে ছেড়ে ও চলে যায় কিনা, দেখতে চান তো? কিন্তু মালিক, ওকে নেবেন কেমন করে? বিরাট জানোয়ার। ভারি।'

'রাইনাকে হেলাফেলা করো না, তাইতক,' কেপুর দিকে ফিরলো আমাস্তান। 'কেপু!'

এক লাফে কাছে চলে এলো কেপু। সঙ্গীর দিকে ফিরলো আমাস্তান। 'তাইতক...এবার...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি মালিক। আপনি কথা বলুন ওর সঙ্গে।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো তাইতক। মেয়েদের তাঁবুর দিকে এগোলো। তিলিয়ানার সঙ্গে কথা বলবে।

সব শুনলো তিলিয়ানা। তাইতকের মতোই চিতাবাঘটাকে

সে-ও হিংসে করতে শুরু করেছে। তাদের কাছ থেকে আমাস্তানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কেপু।

পুব থেকে ধেয়ে এলো ঝড়ো হাওয়া। তিন দিন তিন রাত বইলো একনাগাড়ে। তাঁবু থেকে বেরোতে পারলো না বেদুইনেরা। মুখে কাপড় বেঁধে রাখতে হলো। খুললেই চোখে পড়ে বালি, মুখে ঢুকে যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে গেলেই সর্বনাশ!

অবশেষে থামলো ঝড়। তাইতককে ডেকে পাঠালো আমাস্তান।

'ঘোড়ায় জিন পরাও, তাইতক,' বললো আমাস্তান।

'আমাকে সঙ্গে নেবেন, মালিক?'

'নেবো। তবে রেগ-এ ঢুকছো না তুমি। ওখানে আমি একা যাবো। বেশি দেরি করবো না। যাও, জলদি কাজ সেরে ফেলো।'

কোনোভাবে টের পেয়ে গেছে কেপু, ওরা বাইরে বেরোচ্ছে। অস্থির হয়ে পায়চারী করছে তাঁবুর ভেতরে। বারবার তাকাচ্ছে প্রভুর গলায় ঝোলানো রূপার বাঁশির দিকে, ওটা বাজিয়েই তাকে হুকুম করে প্রভু।

'কেপু, এসো,' ডাকলো আমাস্তান।

প্রভুকে অনুসরণ করে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো কেপু।

রাইনার পিঠে জিন পরানো হয়ে গেছে। চিতাবাঘটাকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়লো একবার। খুর

ঘষতে লাগলো বালিতে।

'চুপ, রাইনা!' আদেশ দিলো তাইতক।

খুর ঘষা বন্ধ করলো, কিন্তু অস্থিরতা গেল না ঘোড়াটার। শংকিত চোখে চেয়ে আছে কেপুর দিকে।

মোটা একটা মোষের চামড়ার চাদর বের করলো তাইতক। দুই প্রান্তে চামড়ার ফিতে। চাদরটা রাইনার পিঠে বাঁধলো সে, জিনের পেছনে। চিতার নখের আঁচড় থেকে ঘোড়ার পিঠ বাঁচানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা।

কেপুর গলায় একটা চামড়ার বেল্ট। তাতে সোনার কারু-কাজ। নিচু হয়ে বেল্টটা খুলে নিলো আমাস্তান। কালো একটা কাপড় কয়েকবার পেঁচিয়ে বাঁধলো কেপুর চোখে মুখে। মরুর রোদ এখন আর চিতাবাঘটার চোখের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

অন্ধকার কেপুর পছন্দ। কোনোরকম বাধা দিলো না সে।

ধরাধরি করে কেপুকে রাইনার পিঠে তুলে দেয়া হলো। বাঁশি বাজালো আমাস্তান। লাফিয়ে বালিতে নেমে পড়লো কেপু। আবার বাঁশি বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো কেপু, আন্দাজে। চোখ বাঁধা, কিন্তু তবু জায়গামতো উঠতে ভুল করলো না।

'দেখলে তো?' গর্বিত চোখে তাইতকের দিকে তাকালো আমাস্তান।

চামড়ার বেল্ট দিয়ে জিনের সঙ্গে কায়দা করে বেঁধে দেয়া

হলো কেপুকে। ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলেও এখন আর পড়ে যাবে না সে।

ঘোড়ায় চাপলো আমাস্তান। তাইতককে বললো, 'চলো।'

শিগগিরই তাঁবু পেছনে ফেলে এলো ওরা। বৃষ্টি হয়েছে। চাঙা হয়ে উঠেছে আবার ক্যাকটাস। তাজা সবুজ হয়ে গেছে ঘাস।

এর্গ পেরিয়ে একটা পাহাড়ি উপত্যকায় চলে এলো ওরা। পাহাড়ের গোড়ার কাছে নহর বয়ে যাচ্ছে, তামাটে-নীল পানি।

ছোট পাহাড়। নহর পেরোলো দুই ঘোড়সওয়ার। ঘুরে চলে এলো আরেক পাশে। সামনে ধু ধু মরুভূমি।

তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে ছুটলো ঘোড়া। পথ চেনা ওদের। নিয়মিত লবণ-ব্যবসায়ীদের কাফেলা যাতায়াত করে ওপথে। চোখে পড়লো পাথরের মরুভূমি। ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনলো। রেগের প্রান্তে এসে রাশ টেনে ধরলো আমাস্তান। তাইতকের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি এখানেই থাকো।'

'কিন্তু, মালিক, যদি পথ হারিয়ে ফেলেন? সর্দারকে কি জবাব...'

'আমার হুকুম মানাই তোমার কাজ, সর্দারের নয়।'

'না, তা নয়। তবে...'

'কোনো তবে-টবে নেই। আমি বলছি এখানে থাকতে, থাকো। কেপুকে নিয়ে একা যাবো আমি।'

সেই মালভূমির ধারে চলে এলো ওরা। ক্যাকটাস, লম্বা

ঘাসের মাঠ, পাথর। ওই মালভূমিতেই গুহায় বাস করে বাবা চিতার পরিবার।

ঘোড়া থেকে নামলো আমাস্তান। কেপুর বেল্টের বাঁধন খুলে দিলো। চোখ থেকে খুলে ফেললো কালো কাপড়।

চোখ মিটমিট করছে কেপু। রোদ ততো কড়া নয় এখন। বিকেল হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এলো সে প্রভুর আদেশ পেয়ে।

জায়গাটা চিনতে পারলো কেপু। ওই তো, মালভূমি, ওখানেই আছে তার মা-বাবা-ভাই। চলে যাবে ওখানে!

কেপুর আচরণ তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে আমাস্তান। চিতার ঘটার মনে কিসের খেলা চলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সে। কয়েক শো গজ দূরে ঘাসের মাঠে হরিণ চরছে। সেদিকে দেখালো সে। বাঁশি বাজিয়ে ইঙ্গিত করলো।

আদেশটা বুঝতে পারলো কেপু। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। তারপরই ছুট লাগালো।

এক লাফে রাইনার পিঠে চড়ে বসলো আমাস্তান। ছুটলো কেপুর পেছনে।

আমাস্তানের আগেই পৌঁছে গেল কেপু। একটা হরিণকে মাটিতে ফেলে দিলো সে।

হরিণের গলায় দাঁত বসানোর জন্যে মুখ নামালো কেপু।

'না না, কেপু, না!' চেঁচিয়ে উঠলো আমাস্তান।

মুখ তুলে তাকালো কেপু।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো আমাস্তান। হরিণটার পাশে এসে হুমড়ি খেয়ে বসলো। একবার দেখেই বুঝলো, কোনো আশা নেই। এখনো বেঁচে আছে, তবে শিগগিরই মারা যাবে। মারাত্মক আহত হয়েছে।

কোমরের খাপ থেকে ছুরি বার করলো আমাস্তান। জবাই করে ফেললো হরিণটাকে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত।

দু'হাতে আঁজলা করে রক্ত নিলো আমাস্তান। কেপুর মুখের কাছে ধরলো। চেটে চেটে খেতে লাগলো কেপু। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমাস্তানের মুখ। তার সব কথা শোনে কেপু। তাইতকের কথা ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছে সে। কেপু তাকে ছেড়ে যাবে না। তাকে দিয়ে চিতার মতোই শিকার করাতে পারবে।

বালির পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছে যেন সূর্য। লাল-আলো ছড়িয়ে পড়েছে বালিতে। চিকচিক করছে সবুজ ঘাস, রক্ত মাখিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা মরু-ভূমিতে। রাতের বেশি বাকি নেই।

হরিণের খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে ঝোলায় ভরলো আমাস্তান। বাকিটা খেতে দিলো কেপুকে।

সাঁঝের বেলা আবার ঘোড়ায় চড়লো ওরা।

সে-রাতে আবার বসলো গানের জলসা।

গাইলো তিনা-গালুজ, দাসিন, থেইয়া।

তিলিরানার পালা এলো। এগিয়ে বসলো সে। ভাইয়ের

দিকে চেয়ে হাসলো। 'ভাইয়া, শুধু তোদের জন্যে গাইবো আমি। তুই আর চিতাবাঘটার জন্যে।'

আজ আর চিতাগুলো নেই আমাস্তানের পায়ের কাছে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে সে। বুকের কাছে শুয়ে আছে কেপু। চেয়ে আছে গায়িকার দিকে।

বেজে উঠলো আমজাদ্। সুললিত গলায় গান ধরলো: তিলিয়ানা।

বাইরে গভীর হচ্ছে রাত। তাঁবুর গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দামাল হাওয়া। আমাস্তানের মনে হলো, আজ আর বিলাপ করছে না বাতাস। হা-হা করে হাসছে প্রাণখোলা হাসি।

বারো

সিংহ

দিন যায়। যায় হপ্তা, মাস, বছর।

তাঁবুর ভেতরে, সিংহের চামড়ায় বসে খেলছে কেপু। রূপালি বাঁশিটা নিয়ে। অনেক বড় হয়েছে সে।

পাশেই ঘুমিয়ে আছে আমাস্তান। তার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। সেদিকে খেয়াল নেই কেপুর। থাবা দিয়ে বাঁশিটাকে একবার সামনে গড়িয়ে দিচ্ছে, একবার টেনে আনছে। নাক নামিয়ে শুঁকছে মাঝে মাঝে। প্রভুর গায়ের গন্ধ লেগে আছে বাঁশিটাতে। আমাস্তানের কণ্ঠস্বরও যেন ঢুকে আছে বাঁশির ভেতরে।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে কেপু। সিহোকে দেখছে, বাবা চিতাকে দেখছে, তার ভাইকে দেখছে। দেখছে অন্ধকার গুহাটা। যেখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘুমাতো সবাই। দেখছে শিকারের দৃশ্য, চিতা মা আর বাবার সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছে সে। শিকার করছে।

অনেক অনেক দূরের ভাসা ভাসা একটা ছবিও ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ঘন জঙ্গল...মাথার ওপরে ঘন পাতার চাঁদোয়ার ফাঁক-ফোকর--ঘন নীল...লাল পাখি...রঙিন প্রজাপতি · সাভান্নায় ঘাসের মাথা দোলানোর শব্দ ··নদীর পানির কুলুকুলু...

প্রতিটি তাঁবুর সব মানুষ ঘুমে অচেতন। বাইরে তারাজ্বলা রাত। নীরব নিস্তব্ধ। দড়িতে বাঁধা ঘোড়াগুলো কথা বলছে। খাচ্ছে। সারারাতই ওরকম কথা বলবে ওরা।

খুঁটিতে বাঁধা শেকলে আটকানো পা উটগুলোর। থেকে থেকেই অদ্ভুত গলায় কেশে উঠছে। ওরকম কাশবে সারারাতই।

কান পেতে সব শুনছে কেপু। শুনছে নিশির আওয়াজ। তার গলায় শেকল নেই। মুক্ত। ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারে। ঘুমন্ত আমাস্তানের দিকে তাকালো সে...

খুব ভোরে উঠবে প্রভু। বড় এক পাত্র উটের দুধ এনে রাখবে তার মুখের সামনে। দুধ খেতে ভালো লাগে না কেপুর, তবু খাবে, শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে। আমাস্তানের সঙ্গে খেলবে সে। চুরুট খেতে খেতে এক সময় একগাল ধোঁয়া কেপুর নাকে মুখে ছেড়ে দেবে প্রভু। চোখ জ্বালা করে কেপুর, ধোঁয়া সইতে পারে না। তবু কোনো প্রতিবাদ করবে না সে। বন্ধুত্বের খাতিরেই।

হয়তো আগামীকালই আবার শিকারে বেরোতে পারে ওরা। ছুটে গিয়ে হরিণ ধরবে কেপু। মাটিতে লুটিয়ে থাকা হরিণের গলায় ছুরি চালাবে আমাস্তান। রক্ত খেতে দেবে কেপুকে।

ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ না কেপুর। সে শিকার ধরবে, গলায় দাঁত বসাবে, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত চাটবে। কিন্তু তা না। সে শুধু ধরবে, বাকি কাজ করে দেবে প্রভু। এভাবে শিকার মোটেই পছন্দ নয় কেপুর। তবু করে, শুধু আমাস্তানকে ভালোবাসে বলে। ভালোবাসে গভীর কালো চোখ দুটোকে, ভালোবাসে তামাটে রঙের মুখটাকে, মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মিষ্টি কথাগুলোকে।

হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন অন্ধকার রাত। আর উপেক্ষা করতে পারলো না কেপু। কান পেতে শুনলো একবার কুকুর-গুলোর চিৎকার। দূরে দূরে থাকে ওরা, আমাস্তানের তাঁবুর কাছে ঘেঁষে না, কেপুর ভয়ে।

অতি সামান্য দুলে উঠলো তাঁবুর দরজা। বেরিয়ে এসেছে কেপু। নিঃশব্দে। আকাশের দিকে তাকালো একবার। ঘোড়া-গুলোর দিকে ফিরলো। তারপর তাকালো সামনের ধুধু মরুর দিকে। পা বাড়ালো সে।

'হাঁটতে যাচ্ছে কেপু,' বললো একটা ঘোড়া।

'আবার ফিরে আসবে,' বললো আরেকটা।

'অন্যান্য দিনের মতো!'

'হ্যাঁ, অন্যান্য দিনের মতো!'

উটগুলোর পাশ কাটিয়ে এলো কেপু। একটার পর একটা তাঁবু পেরিয়ে এলো। মরুভূমিতে এসে নামলো। হেঁটে চললো সামনের দিকে।

লাল বালির পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালো কেপু। পাহাড়ের গোড়ায় বয়ে যাওয়া নহরের দিকে তাকালো। তামাটে-নীল পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে তারার আলো। জোরে জোরে শ্বাস টানলো সে, গন্ধ নিলো বাতাসে। হাজারো গন্ধ এসে নাকে লাগছে, চারদিক থেকে। আসছে স্বট ঘাসের শুকনো গন্ধ, ক্যাকটাসের ভেজা ঝাঁঝ, অনেক অনেক দূর থেকে চিতার গন্ধও আসছে যেন। মিমোসার গন্ধ পাচ্ছে ও, পাম রসের গন্ধ পাচ্ছে, পাচ্ছে গরুর চামড়ার গন্ধ—ওটা তাঁবুর। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে আসছে আরেকটা গন্ধ। রূপার বাঁশিতে লেগে থাকা গন্ধ। আমাস্তানের ঘামের।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে কেপু। নহর পেরোতে দ্বিধা করছে। ওই ঘামের গন্ধ না শুঁকে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না সে, বুক ভরে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে এখুনি।

ফিরলো কেপু। হেলেদুলে এগিয়ে চললো আবার তাঁবুর দিকে। তালে তালে মাথা দুলছে একবার এপাশে একবার ওপাশে। লম্বা লেজের ডগা ঘষা খাচ্ছে বালিতে।

নিঃশব্দে এসে আবার তাঁবুতে ঢুকলো কেপু। তখনো ঘুমাচ্ছে আমাস্তান। ভোর হতে দেরি আছে।

বাইরে কথা বলছে ঘোড়াগুলো। 'বলেছিলাম না, ফিরে আসবে কেপু।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলে।'

প্রভুর পাশে বিছানো সিংহের চামড়ায় এসে শুয়ে পড়লো

কেপু। ঘুম আসবে না। রাতে ঘুমাতে পারে না সে। দিনে ঘুমায়। প্রভুর গায়ের গন্ধ আসছে নাকে। জেগে জেগে আবার স্বপ্ন দেখতে থাকলো কেপু...

'মালিক,' বললো তাইতক, 'শুনেছেন তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো আমাস্তান।

'আপনার ঘোড়ায় জিন পরিয়েছি। দেরি করবেন না। সর্দার তৈরি হয়ে বসে আছেন।'

'আমিও তৈরি।'

'কেপুকে নিচ্ছেন না-তো?'

'কেন, নেবো না কেন?'

'সর্দার যদি...'

'খালি সর্দার, সর্দার! সর্দার যদি এটা করেন...সর্দার যদি ওটা করেন আমার ইচ্ছে। কেপুকে সঙ্গে নেবো কি নেবো না, সেটা আমার ইচ্ছে।'

'ভেবে দেখুন, মালিক।'

'ভেবেছি। কেপুকে নিয়েই যাবো আমি।'

আর কিছু বললো না তাইতক। জানে, বলেও লাভ নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আমাস্তান, আর তাকে টলানো যাবে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সে তাঁবু থেকে।

গোত্রে গোত্রে আগের মতো আর শত্রুতা নেই বেদুইনদের। কাজেই লড়াইও হয় না আর তেমন। রেজু আর অন্যান্য চোর-

ডাকাতেরা তাবুকার নাম শুনলেই কাঁপে। ওরাও সামনা-সামনি লাগতে আসে না। বারবার পর্বতে লুকিয়ে থাকে, মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসে। লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তাদের উট চুরি করে। বসে থাকতে ভালো লাগে না। তাই মাঝেমধ্যেই শিকারে বেরিয়ে পড়ে তাবুকা আর তার যোদ্ধারা। সবচেয়ে বেশি ভয়, বেশি উত্তেজনা সিংহ শিকারে। তাই সিংহই শিকার করে ওরা। লড়াইয়ের খিদে কিছুটা মেটে এতে।

তাঁবু থেকে বেরোলো আমাস্তান। ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে তার বাবা।

'জলদি করো, আমাস্তান,' বললো সর্দার। 'আজ তোমার শক্তি পরীক্ষা হবে।'

কেপুকে রাইনার পিঠে উঠতে বললো আমাস্তান। এক লাফে উঠে পড়লো কেপু। ভুরু কুঁচকে দেখলো সর্দার। কিন্তু কিছু বললো না। বলে লাভ হবে না, সে-ও জানে। ছেলেকে চেনে ভালোমতোই।

বিশাল মরুর পুবে রওনা হলো ওরা। কাফেলা চলাচলের পথ ধরে এগোলো। শিগগিরই পথ থেকে সরে এলো দলটা। এথাল গাছের ছোট এক জঙ্গল পেরোলো। অদ্ভুত দেখতে গাছগুলো। কালচে রঙ, বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঁকানো ডালাপালা। দেখে মনে হয়, আগুন লেগেছিলো বনে, আধপোড়া হয়ে বেঁচে আছে কোনোমতে। বনের ওপারে কয়েকটা বালির টিলা। তার ওপাশে শুরু হয়েছে কাঁটাঝোপ আর কাঁটালতার প্রান্তর। প্রান্তরের

শেষে তাজেরো মালভূমি। ব্যাসল্টে তৈরি ওই মালভূমিতেই বাস করে সিংহ।

দুপুর নাগাদ মালভূমির ধারে এসে পড়লো দলটা। ঘোড়া থেকে নামলো সবাই। বিশ্রাম করবে। চা খাবে। তারপর শুরু হবে শিকার।

গাছের ছায়ায় বালিতে কার্পেট বিছানো হলো। তাতে বসলো সর্দার। অন্যরা ঘিরে বসলো তাকে। চা এলো। পর পর তিন কাপ। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মিশ্রি ভেঙে চায়ে মেশানো হলো। কড়া মিষ্টি দিয়ে খেতে অভ্যস্ত সবাই। শেষ কাপ চায়ে এতো মিষ্টি, তরল চিনি বললেও চলে।

আগুন ঢালছে সূর্য। পাহাড়ী সিংহ শিকারের এটাই উপযুক্ত সময়। ভোরের দিকে ভরপেট খেয়েছে সিংহ। ঝোপের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে এখন। মাছির অসহ্য জ্বালাতনকেও গ্রাহ্য করে না এসময়।

টিন-ক্যানেস্তারা আর ঢাকঢোল নিয়ে কয়েকটা ঝোপকে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেললো খেদানেরা। বিকট শব্দ উঠলো। সিংহের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে খেদিয়ে আনার ব্যবস্থা।

দুপুরের রোদ, প্রচণ্ড গরম, তীব্র আলো, বিচ্ছিরি গোলমাল, কোনোটাই ভালো লাগছে না কেপুর। রাইনার পিঠে বসে উসখুস করছে সে।

বেদুইনদের সিংহ শিকারে বীরত্ব আছে, ভয় আছে, আছে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ঘোড়ার দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতার ওপর নির্ভর

করে শিকারির প্রাণ। গর্জন করে ছুটে আসে সিংহ। এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে শিকারিরা। বর্শা হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায় সারির এক মাথার প্রথম লোকটা। সিংহের মুখে চামড়ার একটা চাদর ছুঁড়ে মারে। রাগে অন্ধ হয়ে থাকে সিংহ। চাদরকেই শত্রু ভেবে আক্রমণ করে বসে। দাঁতে-নখে ছিঁড়তে শুরু করে। এই সুযোগে তার কাছে চলে যায় শিকারি। পা দিয়ে ঘোড়ার পেট আঁকড়ে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে। সিংহের বুকে বিঁধিয়ে দেয় বর্শা। ভয়ানক গর্জন করে উঠে তার ওপর সিংহ লাফিয়ে পড়ার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে। এইবার ছুটে আসে সারির দ্বিতীয় লোকটা। বর্শা বিঁধিয়ে দেয় সিংহের শরীরে। সরে যায়। আসে তৃতীয়জন। এভাবে একজনের পর একজন আসে শিকারিরা, বর্শা বিঁধিয়ে দিতে থাকে শিকারের গায়ে। এক সময় নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সিংহ।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শিকারিরা। সারির মাথায় আমাস্তান। সর্দারের নির্দেশ। আমাস্তানের বীরত্ব আর সাহসের পরীক্ষা হবে আজ।

ভীষণ গর্জন করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো পশুরাজ। বিকট হাঁ, ঘন কেশর। প্রকাণ্ড শরীর। লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়লো।

'কেপু, এসো যাই!' পেছনে ফিরে বললো আমাস্তান। বেল্ট খুলে দিয়েছে চিতাবাঘটার। রাইনার পেটে গুঁতো

লাগালো জুতোর ডগা দিয়ে।

এর আগেও সিংহ শিকারে এসেছে আমাস্তান। তবে অংশ নিলো এই প্রথম। রাইনাও। সে-ও এর আগে আর সিংহের মুখোমুখি হয়নি।

একটা বোকামি করে বসলো আমাস্তান। চামড়ার চাদর নিতে ভুলে গেল। সিংহের একেবারে সামনে চলে এসে বুঝতে পারলো ভুলটা। দেরি হয়ে গেছে। তাড়া করে এসেছে সিংহ। এখন আর পিছিয়ে যাবার সময় নেই। তার আগেই গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহ।

ব্যাপারটা সর্দারও খেয়াল করেছে। তাইতকও। বর্শা বাগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো সে সাহায্য করতে।

প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলো সিংহ। আতংকে দিশেহারা হয়ে পড়লো রাইনা। লাগাম টেনে ধরেও তাকে কথা শোনানো যাচ্ছে না। চামড়ার ফিতের ঘষায় দু'কষ ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

একই সঙ্গে ঘটলো কয়েকটা ঘটনা। লাফ দিলো সিংহ। রাইনাও লাফ দিলো। ঠিক তার বুকের তলায় এসে পড়লো সিংহ। থাবা চালালো। চিরে দিলো ঘোড়ার বুক পেট। বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ করে বেরিয়ে পড়লো নাড়িভুঁড়ি। রাইনা কাত হয়ে পড়ে যাবার আগেই বর্শা চালালো আমাস্তান। গেঁথে দিলো সিংহের বুকে।

কাত হয়ে পড়ে গেল রাইনা। তার পিঠের নিচে পা আটকে

গেল আমাস্তানের। টানাহেঁচড়া করেও বের করতে পারলো না। ভীষণ ক্ষেপে গেছে আহত সিংহ। থাবা বাগিয়ে এগিয়ে এলো সে। এক থাবায় শেষ করে দেবে পুঁচকে মানুষটাকে।

রাইনা পড়ে যেতেই কেপুও ছিটকে গিয়ে পড়লো বালিতে। এক গড়ান দিয়েই উঠে পড়লো। দেখলো, আমাস্তানকে শেষ করতে আসছে সিংহ। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো সে। লাফ দিয়ে এসে পড়লো সিংহের ওপর। সিংহের থাবার আঘাত আমাস্তানের ওপর না লেগে এসে লাগলো কেপুর গায়ে। তার কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত চিরে গেল। কিন্তু আমলই দিলো না কেপু। সিংহের নাকেমুখে থাবা মারলো। আর্তনাদ করে উঠে ওপরের দিকে মুখ তুললো সিংহ। তার গলার নিচের দিকটা ঠেলে বেরিয়ে এলো। আবার থাবা চালালো কেপু। জবাই হয়ে গেল সিংহ। কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল কণ্ঠনালী। ফোয়ারার মতো রক্ত ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এসে গেছে শিকারিরা। দরকার নেই, তবু একের পর এক বর্শা বিঁধিয়ে দিলো সিংহের শরীরে। দু'য়েকবার খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল সিংহের দেহ। ঘোড়া থেকে নেমে এলো ওরা। মৃত রাইনার-তলা থেকে বের করে আনলো আমাস্তানকে। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। চোখ বোজা। শ্বাস-প্রঃশ্বাস অতি ক্ষীণ।

গাছের তলায় এনে বালিতেই শুইয়ে দেয়া হলো আমাস্তানকে। একবার চোখ মেললো। তার পাশেই বসে আছে কেপু।

উদ্বগ্নি চোখে চেয়ে আছে।

হাসি ফুটলো আমান্তানের চেহারায়। হাত রাখলো কেপুর রক্তাক্ত পিঠে। 'কেপু, আমার কেপু···' গড়িয়ে পড়লো হাতটা। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

মুখ নামালো কেপু। চেটে দিতে লাগলো প্রভুর কাটা জায়গার রক্ত।

তেরো

উপহার

'কেপু!'

মোলায়েম গলায় ডাকটা শুনলেই মৃদু গররর করে ওঠে কেপু। জানায়, সে আছে পাশে। আবার চোখ বন্ধ করে আমাস্তান।

অসুস্থ,আহত আমাস্তান। সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তার পাশেই বসে থাকে কেপু। সহজে নড়ে না ওখান থেকে। কি জানি, কখন চোখ মেলে প্রভু। তাকে ডাকে! বুড়ো আবদুল যখন দেখতে আসে আমাস্তানকে, তার মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে মলম লাগায়, তখনো সরে না কেপু। প্রভুর পাশে শুয়ে থেকে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

কয়েকটা দিন খুব খারাপ অবস্থা গেল। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হলো আমাস্তানকে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো পুরো গোত্র। তারপর, ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল আশংকা। ভালো হয়ে উঠতে লাগলো আমাস্তান। সাংঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছে সে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এখনো।

'কেপু!' আবার ডাকলো আমাস্তান।

ফিরে চাইলো কেপু। উঠে গিয়ে বসলো প্রভুর পাশে। হাত চেটে দিলো।

আরো দু'দিন পর। উঠে দাঁড়াতে পারলো আমাস্তান। তাঁবুর ভেতরই হাঁটাহাঁটি করলো কয়েক পা। ক্লান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়লো আবার।

ভালো হয়ে উঠলো আমাস্তান। কেপুকে দুধ খাওয়াতে পারে এখন। রূপালি বাঁশি বাজিয়ে তাকে আদেশ দিতে পারে। কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিবর্তন আসছে কেপুর মাঝে। আগের মতো আর কোনো কিছুতেই উৎসাহ পায় না। কেমন একটা পরিবর্তন অনুভব করে শরীরে। কি যেন একটা চাহিদা। বুঝতে পারে না। আজকাল বেশি করে মনে পড়ছে বাউ জঙ্গলের কথা। বেশি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে।

পরিবর্তন আসছে আমাস্তানের মাঝেও। পুরো গোত্র তাকে নিয়ে গর্বিত। এই বয়সেই বিরাট সিংহের সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেছে। তার কাছাকাছি ঘুরঘুর করে মেয়েরা। আগে আমলই দিতো না, এখন একটু একটু করে ওদের দিকে ঝুঁকছে সে।

পুরো সুস্থ হয়ে উঠলো আমাস্তান। তার সম্মানে এক জলসার আয়োজন হলো। ভুড়িভোজের পর শুরু হলো গান-বাজনা। হাসি-আনন্দে ভরে উঠলো সর্দারের তাঁবু।

ছোটো আমজাদ বাজিয়ে গান ধরলো তিলিয়ানা। তার

সঙ্গে গলা মেলালো থেইয়া। বেদুইনদের প্রিয় একটা গান গাইলো। কথাগুলো বড় সুন্দর ঃলু হাওয়ার আগে আগে ছুটে চলেছে এক দুরন্ত ঘোড়সওয়ার। হাতে বর্শা। বর্শায় বাঁধা ঘুঙুর বাজছে টুংটাং টুংটাং, ছোটার তালে তালে।

আজ আর গান ভালো লাগছে না কেপুর, কিছুই ভালো লাগছে না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে। পায়চারি করতে লাগলো অস্থিরভাবে।

অনেক রাতে শেষ হলো গান। একে একে বেরিয়ে এলো সবাই সর্দারের তাঁবু থেকে। সব শেষে বেরোলো মেয়েরা, সঙ্গে আমাস্তান। তাকে দেখে এগিয়ে এলো কেপু।

'আমাদের সঙ্গে অতো হাসাহাসি করিস না ভাইয়া,' হেসে বললো তিলিয়ানা, 'কেপুর হিংসে হচ্ছে! দেখছিস না, কেমন মুখ গোমড়া করে রেখেছে?'

রসিকতায় খিলখিল করে হেসে উঠলো সবাই।

'সবাই জানে, কেপুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো তুমি,' বললো তিনা-গালুজ। হাসলো। মুক্তার মতো ঝকঝক করে উঠলো শাদা দাঁত।

দাসিন দাঁড়িয়ে আছে তিলিয়ানার পাশে। কনুই দিয়ে আলতো খোঁচা দিলো সবার অলক্ষ্যে।

'এই চল চল,' বান্ধবীদের তাড়া দিলো তিলিয়ানা। 'রাত হয়ে গেছে। ঘুমোতে হবে।'

সবাইকে নিয়ে চলে গেল তিলিয়ানা, শুধু দাসিন রইলো।

আমাস্তানের কাছ ঘেঁষে এলো সে। নরম গলায় ডাকলো, 'আমাস্তান!'

'দাসিন!'

স্থির হয়ে গেল কেপু। তাকে যেভাবে ডাকে আমাস্তান, তেমনি মোলায়েম গলা।

ঘুমিয়ে পড়েছে আমাস্তান। তার ভারি শ্বাস-প্রঃশ্বাস কানে আসছে কেপুর। স্বপ্ন দেখছে সে। নাড়াচাড়া করছে রূপালি বাঁশিটা।

কিছুই ভালো লাগছে না কেপুর। অন্ধকার কেবলই হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে। ডাকছে বাউ জঙ্গল···ক্রি নদী...সাভান্না

ঘুমন্ত আমাস্তানের দিকে তাকালো কেপু। উঠলো। বসলো গিয়ে প্রভুর পাশে। হাত চেটে দিলো, কপাল চেটে দিলো। ঘুমের মাঝেই বিড়বিড় করে উঠলো আমাস্তান, 'কেপু...আমার কেপু...'

প্রভুর কাছ থেকে সরে এলো কেপু। বাঁশিটা মুখে তুলে নিলো। চলে এলো দরজার কাছে। ফিরে চাইলো একবার। তারপর বেরিয়ে এলো।

তাঁবুর গায়ে আছড়ে পড়ছে দামাল হাওয়া। কেপুকে দেখেই কুঁইই করে সরে গেল একটা কুকুর। কেশে উঠলো একটা উট।

খাওয়া বন্ধ করে চোখ তুলে চাইলো ঘোড়াগুলো। 'হাঁটতে

যাচ্ছে কেপু,' বললো একটা ঘোড়া।

'আবার ফিরে আসবে,' বললো আরেকটা।

ঘোড়া, উট, তাঁবু পেরিয়ে এলো কেপু। চললো মরুভূমির ওপর দিয়ে। চলে এলো সেই লাল পাহাড় আর নহরের ধারে। কানে আসছে রাতের বিচিত্র সব শব্দ, বিচিত্র গন্ধ। অভ্যাস মতো থমকে দাঁড়ালো কেপু। গন্ধ শুঁকলো। কিন্তু আজ আর দ্বিধা নেই। তার কাছেই রয়েছে আমাস্তানের গন্ধ। ওই গন্ধ পেতে হলে ফিরে আবার দরকার নেই।

কানে বাজছে যেন আমাস্তানের কণ্ঠস্বর। কেপু···কেপু··· কেপু···। ফিরে দাঁড়াতে গিয়েও যেন আরেকটা ডাক শুনতে পেলো সে। কেপু, ফিরে আয় মা···মায়ের বুকে ফিরে আয়··· ফিরে আয়···তোর স্বপ্নের জগতে ফিরে আয়···। কে ডাকে এমন করে ?···বুঝতে পারলো না কেপু। কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাউ জঙ্গল...ক্রি নদী...সাভান্না...। আর উপেক্ষা করতে পারলো না সে। আমাস্তান তার বন্ধু, কিন্তু মায়ের চেয়ে বড় নয়। তাকে যেতেই হবে...সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বন্ধুর শেষ উপহার...তার গায়ের গন্ধ মাখানো রূপার বাঁশি...

নহর পেরিয়ে এলো কেপু। পাহাড়ের অন্যপাশে চলে এলো। নামলো মরুভূমিতে। গতি বাড়ালো।

একনাগাড়ে হাঁটলো কেপু। চলে এলো সেই তৃণভূমিতে, স্বল্প ঘাসের মাঠে, যেখানে চড়ে বেড়ায় হরিণের পাল। যেখানে প্রথম তাকে শিকার ধরতে শিখিয়েছিলো সিহো আর বাবা

চিতা...

মাঠের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো কেপু। খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে দুটো পাহাড়ি শেয়াল। দুটোকেই চেনে কেপু। বুড়ো হয়ে গেছে এখন। সামনের দিকে তাকালো সে। চোখে পড়লো ক্যাকটাস, পাথর, মালভূমি...সব পরিচিত। বাড়ি ফেরার আনন্দ কেপুর মনে। নিশ্চয় গুহায় ঘুমিয়ে আছে তার বাবা-মা, আর ছোট্ট ভাইটা...প্রায় ছুটতে শুরু করলো কেপু...

গুহার কাছে পৌঁছে গেল কেপু।

ফিরে তাকালো একবার। নিচে ক্যাকটাস। দূরে ঘাসের মাঠে হরিণের পাল। চোখের সামনে লাফ দিয়ে উঠে এলো যেন অসংখ্য পুরোনো স্মৃতি। মুখ থেকে ফেলে দিলো বাঁশিটা। শুঁকলো একবার। না, গন্ধ আর নেই। তার লালা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের গন্ধ। আর ওটা সঙ্গে নিয়ে কি হবে?... কানের কাছে ডেকে উঠলো যেন একটা কণ্ঠ, মোলায়েম ডাক: কেপু।

থমকে দাঁড়ালো কেপু। চাইলো এদিক ওদিক। কই, সে তো নেই।

আবার পা বাড়ালো কেপু। আবার শোনা গেল ডাক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর আবার পা বাড়ালো। আর ফিরবে না। আর ফিরে যাবে না বন্ধুর কাছে। বুকে করে নিয়ে যাবে তার সবচেয়ে বড় উপহার: ভালোবাসা।

চোদ্দ

নিশিকন্যা

গুহায় ঢোকার আগে গন্ধ শুঁকলো কেপু। নাকে এসে লাগলো অতি পরিচিত গন্ধ। চিতার গন্ধ।

ভেতর থেকে কাশির শব্দ এলো। চাপা, শুকনো গলা। থুথু ছেটানোর শব্দ।

ঢুকে পড়লো কেপু।

'কেপু!'

সরু সুড়ঙ্গ। কেপুর ঢুকতেই কষ্ট হচ্ছে। সিহোর ডাক শুনে ছুটে যেতে চাইছে। কিন্তু সরু সুড়ঙ্গের জন্যে পারছে না।

মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো কেপু।

'কেপু!'

মেয়ের বিরাট নাকটা চেটে দিলো সিহো। পাশে শুয়ে পড়লো কেপু। অনেক বড় হয়েছে সে। চিতা মায়ের কাছে তাকে এখন একটা দানবের মতোই দেখাচ্ছে। আগের মতোই মায়ের কোলের কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে শু'লো সে।

"কেপু, আমার কেপু!'

'মা...'

'খুকি...আবার ফিরে এসেছিস। চোখে আর ভালো দেখি না এখন, তবু ঠিক তোকে চিনতে পেরেছি। কতো বড় হয়ে গেছিস, মা।

'বাবা কোথায়, মা?'

'মারা গেছে। আর কোনোদিন শিকারে যাবে না সে।'

খানিক নীরবতা। তারপর বললো কেপু, 'আমার ছোট্ট ভাইটা?'

হাসি ফুটলো সিহোর চোখে। 'ও আর ছোট্ট নেই, কেপু। অনেক বড় হয়েছে। অনেক সুন্দর! ইস্, এখন যদি দেখতি তাকে।'

'ও শিকারে গেছে? শিগগিরই ফিরবে তো?'

'না।'

'না। ও কি তোমাকে ফেলে চলে গেছে, মা!'

'না। ওর এখন আর আমার কাছে থাকার দরকার নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, খাওয়ার রুচি নেই, খুব অল্পই খাই এখন...তাছাড়া শিকার এখনো করতে পারি...'

কি শিকার করতে পারে, জানালো না সিহো। হরিণ কিংবা অন্য কোনো জানোয়ার ধরার ক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়েছে সে। খুব বেশি খিদে পেলে গুহা থেকে বেরোয়। ছোটো গিরগিটি, বালির কাঁকড়া, ঘাস-ফড়িঙ ধরে। তাও অনেক কষ্টে,

অনেক কৌশলে।

'খুব বেশি খাবার লাগে না...' আবার বললো সিহো। 'ছেলেটা গেছে, বাধা দিইনি...ও এখন চিতার সমাজে সবচেয়ে শক্তিমান। ফাহাদ মরে গেছে। চিতাদের সর্দার হয়েছে এখন তোর ভাই।'

'সর্দার!'

'হ্যাঁ। আইন এখন তার হাতে, কেপু।'

পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলো মা-মেয়ে। সবই পুরোনো দিনের কথা। ফাহাদের কথা, বাবা চিতার কথা। আজ প্রথম জানালো সিহো, কেপু তার নিজের মেয়ে নয়। জানালো, বনের ভেতর কিভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে চিরগুকে। ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠলো কেপুর...

সিহো অসুস্থ। কথার মাঝে মাঝেই কেশে উঠছে।

'মা, নিশ্চয় তোমার খিদে পেয়েছে। আমি তোমার জন্যে শিকার করে আনছি।'

'না।'

'কেন মা?'

'কেপু, আমার খিদে পায়নি।'

'ঠিক আছে। খিদে পেলে বলো।'

'না, মা, তুই চলে যা।'

'কি বলছো, মা! তোমাকে একা ফেলে!'

'কেপু, লক্ষ্মী মেয়ে আমার। তুই চলে যা। আমার জীবন শেষ। সুখের দিন অনেক দেখেছি। তোর সবে শুরু হয়েছে। তাছাড়া তুই চিতাবাঘের মেয়ে, চিতার সঙ্গে আর কতোকাল কাটাবি? তোকে ছেড়ে দিতে খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু স্বার্থপর হতে পারবো না আমি। কেপু, আর মাত্র একটিবার আমার আদেশ মানতে হবে তোকে।'

'মা!'

'তোরা অন্ধকারের জীব, মা। দিনের আলো তোদের শত্রু।'

'কিন্তু মা.

'তুই নিশির কন্যা। অন্ধকার তোকে পথ দেখাবে। নিয়ে যাবে তোর দেশে, সেই ছোট্ট বেলায় যেখান থেকে চলে এসেছিস। দেখলেই আবার চিনতে পারবি তোর দেশ।'

'তুমি চেনো, মা?'

'না। যাইনি কখনো। চিতারা মরুভূমির বাসিন্দা, গহন বনে বাস করতে পারে না।'

'তুমি যেতে বলছো, মা?'

'হ্যাঁ, কেপু, হ্যাঁ। দেখবি, সে-দেশের ঝোপঝাড় তোর সঙ্গে কথা বলবে। আকাশ কথা বলবে। নদী কথা বলবে। একা মনে হবে না তোর। এখুনি রওনা হয়ে যা। ভোরের আগেই পেরিয়ে যাবি মরুভূমি। সূর্য ওঠার আগেই ঢুকে পড়বি জঙ্গলে...'

শেষবারের মতো মেয়ের নাক-মাথা চেটে আদর করলো সিংহো। 'যা, মা, উঠ। আর দেরি করিসনে।'

বিরাট নদীর ধারে এসে পড়লো কেপু। সাঁতরে পেরলো নদী। ওপারে ঘন জঙ্গল।

জঙ্গলে ঢুকে পড়লো কেপু। কি লম্বা লম্বা গাছ, আর কি ঘন হয়ে জন্মেছে। মাথার ওপরে ঘন পাতার চাঁদোয়া, আলো প্রবেশ করতে পারে না। গাছের গোড়ায় জন্মে আছে ভেজা ভেজা শেওলা আর ফার্ন। তিক্ত, জোরালো গন্ধ। কেমন যেন নেশা ধরায়। চারদিক থেকে, অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে জন্তুজানোয়ারের গন্ধ। ওরা সবাই নিশাচর জীব।

ঠিকই বলেছে সিংহো। চিনতে পারছে সব কেপু। মনে পড়ছে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের নাম। ওই তো, জঙ্গলের ধারে লম্বা ঘাসের ভেতর শুয়ে বিশ্রাম করছে একদল সিগুই—বুনো মোষ।

তারপর, ওই যে, গাছের ডালে ঝুলে আছে বুড়ো আউরো—শিম্পাঞ্জি। চাঁদের আলোয় কেপুকে দেখেই চেঁচামেচি শুরু করে দিলো সে।

বিশাল এক গাছের তলায় বসে জোরে জোরে বুকে থাবা মারলো এবোবো—গরিলা।

দেখতে দেখতে চললো কেপু। থামলো না। কি করে জানি

বুঝেছে, এটা বাউ জঙ্গল নয়।

সে বন পেরোলো কেপু। নিগার নদীর ধারে চলে এলো। নদীর ধার ধরে ধরে চললো কিছুক্ষণ। নদী পেরোলো। তার-পর আবার জঙ্গল।

থামলো না কেপু।

জঙ্গল পেরোলো। পেরোলো বিস্তৃত তৃণভূমি। চোখে পড়লো মালভূমি। কেমন যেন চেনা চেনা।

মালভূমি পেরিয়েই থমকে গেল কেপু। ওই তো, বিশাল সাভান্না। নদীর পানি বয়ে যাওয়ার মিষ্টি কুলুকুলু ধ্বনি আসছে কানে।

প্রায় ছুটে সাভান্না পেরোলো কেপু। ক্রি নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পেট ভরে নদীর মিষ্টি পানি খেলো কেপু। আহ্, জুড়িয়ে গেল যেন শরীর!

নদী পেরোলো কেপু। বনে এসে ঢুকলো।

শেষ হয়ে এসেছে রাত। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে চাঁদ। একে একে ঘরে ফিরে চলেছে নিশাচর প্রাণীর দল। কেপুও ঘরে ফিরে চললো।

আশ্চর্য! কতোদিন পেরিয়েছে, কতো পরিবর্তন হয়েছে জঙ্গলের। কিন্তু জায়গা চিনে ঠিক ফিরে এলো কেপু। যেখানে বাসা বানিয়েছিলো চিরণ্ড আর আবগা, ঠিক সেই জায়গা-টাতে। শুয়ে পড়লো। অনেক পথ হেঁটে এসেছে। ক্লান্ত।

বাড়ি ফিরেছে। এবার ঘুমোতে হবে...

'কে-পু!'—

চমকে চোখ মেললো কেপু। কে ডাকে! সিংহো! আমা-স্তান! নাকি অন্ধকার!

'কে-পু!' আবার শোনা গেল ডাক। মাথার ওপরে।

মুখ তুললো কেপু। গাছের ডালে বসে আছে তার বন্ধুরা, ছোট্টো লাল পাখিরা।

কেপু চাইতেই উড়াল দিলো পাখিগুলো। ফড়ফড় ডানার আওয়াজ তুলে নেমে আসতে লাগলো।

খেলা জমে উঠলো।

বেশিক্ষণ খেলতে পারলো না কেপু। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। বুঝলো পাখিরা। উড়ে গিয়ে বসলো আবার গাছের ডালে।

চোখ মুদলো কেপু। খুললো। আবার মুদলো। কোনো স্বপ্ন নেই। জেগে-তো নয়ই, ঘুমের ঘোরেও আর স্বপ্ন দেখছে না সে।

অনেকদিন পর আবার শান্তিতে ঘুমালো চিরশু আর আব-গার মেয়ে। ঘুমিয়েই কাটাবে সারাটা দিন। বিকেল গড়াবে। সাঁঝ হবে। রাত নামবে বনভূমিতে, সাভান্নায়। তখন জাগবে নিশিকন্যা।

—ঃ শেষ ঃ—